প্রবন্ধ

দুই যাত্রায় এক যাত্রী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

(এই লেখাটির একাংশ ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পূর্ণাঙ্গ করার দরকার আছে, এবং সে কাজে আমি হাতও দিয়েছি। বর্তমান সংখ্যায় সেই কাজেরই কিছুটা প্রকাশ করা গেলো।)

এই কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু ফারুক আহমদ চৌধুরী ফোন করেছিল। উপলক্ষ্যটা ছিল একটি চিঠি হাতে পাওয়া। পুরনো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আমার একটি চিঠি পেয়েছে সে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লেখা, ১৯৫৭ সালে, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি লেকচারার হিসাবে। ফারুক এবং আমার অপর এক সহপাঠী-বন্ধু প্রায়াত আবদুল বারি দুজনেই তখন ওয়াশিংটনে গেছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগদানের কারণে, শিক্ষানবিশ হিসাবে। শিক্ষানবিশ হিসাবে কিছুটা কাল তাদের কাটাতে হয়েছে ওয়াশিংটনের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। নাম ফ্লেচার স্কুল অব ল' অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি। বারির হবি ছিল চিঠি লেখা, দীর্ঘাকারে চিঠি লিখতো, ইংরেজিতে; জবাব আশা করতো অবশ্যই। আমিও দিতাম, যদিও চিঠি লেখাটা মোটেই আমার হবি ছিল না। একটি চিঠিতে বারি লিখেছিল আমেরিকায় এসে সবকিছু দেখে উঁচু উঁচু, বড় বড়; যাতে করে নিজেকে মনে হয় ছোটখাটো সেখানকার মস্ত মস্ত শহরগুলো অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক। মন্তব্যটা আমার মনে আছে, বিশেষ করে এই কারণে যে আমেরিকা তখন পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য নব-আবিষ্কৃত মহাদেশ। সেখানে তখন অনেকেই যাচ্ছেন, ফিরছেন, কাগজে লিখেছেন, মুখে বলছেন, কিন্তু শহরের উচ্চতা যে মানুষকে খর্ব করে দিচ্ছে এমন উক্তি অন্য কারো কাছ থেকে আমি পাইনি।, বারির কাছ থেকে যেমন পেয়েছি। যখন প্রথম বর্ষে পড়ি তখন সে একদিন বলেছিল আমাকে, 'তোমরা যে ভেস্টেড ইনটারেস্টের কথা বলো আমি সেটা বুঝি না।' কায়েমি স্বার্থ জিনিসটা কী আমি তাকে বোঝাতে প্রয়াস নিয়েছিলাম, আমার মতো করেই। সপ্তাহ দুয়েক সে আমাকে বলেছিল, 'আমি কিন্তু তোমাদের চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়ছি। কতটা ঝুঁকে ছিল জানি না। কিন্তু শুনতে ভারি ভালো লেগেছিল।

সে যা-ই হোক, ফারুকের চিঠিটা ছিল বাংলায়, আমাকে সে অভিনন্দন জানিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কারণে; জবাবে আমি যা লিখেছিলাম তার অংশবিশেষ ফারুক পড়ে শোনালো টেলিফোনেই।

লিখেছিলাম, আমি খুশি হতাম সাংবাদিকতায় যোগ দিতে পারলে, কিন্তু সেটা তো হবার নয়। কেননা, পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা তখনো নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে ওঠেনি। পঞ্চাশের দশকে সাংবাদিকতা ছিল অনেকটা অগতির গতি; পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল; সাংবাদিকদের অনেকেই বেতন মাসের শেষ হলেই পেয়ে যাবেন এমন ভরসা রাখতেন না, নিরুপায়ভাবে অপেক্ষা করতে হতো। তবু শিক্ষকতার তুলনায় সাংবাদিকতার প্রতি পক্ষপাত আমার জন্য সত্য ছিল। তাই বলে আমি যে নিজেকে দুর্ধর্ষ একজন রিপোর্টার হিসাবে কল্পনা করতে পারতাম সেটা মোটেই নয়; আমার পক্ষপাত ছিল সম্পাদকীয় পাতার প্রতি। সম্পাদকীয় লিখব, উপসম্পাদকীয় বের হবে ছদ্মনামে, অন্যের লেখা ঝাড়ামোছা করবো– এই রকমের একটা আমলাতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা অল্পবয়সেই আমার কাঁধে ভর করেছিল, যার কথা উল্লেখ করেছি, আর যার হাত থেকে আমি কখনো অব্যাহতি পাইনি, হয়তো বা পেতে চাইওনি।

একটা লোভও ছিল বোধ করি। জনমতকে প্রভাবিত করার। কারো পক্ষে? বলতে পারি গণতন্ত্রের পক্ষে। যদিও গণতন্ত্র ব্যাপারটা কী তা তখন যে স্পষ্ট বুঝতাম তা মোটেই নয়। কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে প্রথম বিদেশে অবস্থানের সময়ে।

পত্রিকার তাৎক্ষণিকতাও আমাকে আকর্ষণ করতো। পত্রিকা অফিসে মনে হতো সর্বদাই নাটক চলছে এবং সে-নাটকের হাতছানি আমার জন্য মোটেই আকর্ষণহীন ছিল না। মাইক্রোফোনও আমাকে টানত, তার মধ্যে ওই যে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ রয়েছে সেই কারণেই হবে। পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, আবাসিক হলের নির্বাচনে, পরে রেডিওতে, মাইক্রোফন হাতে পেলে ভারি খুশি হতাম। রেডিওতে আমি কত যে অনুষ্ঠান করেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সূত্রপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন থেকেই। যোগাযোগটা ঘটে প্রয়াত আবু হেনা মোস্তফা কামালের মাধ্যমে। আবু হেনা নানা দিক দিয়ে চৌকস ছিল, রেডিওর জন্য গান লিখত, সেখানে কবিতা পড়ত, প্রোগ্রাম প্রডিউসারদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল; তাকে খুব উৎসাহ দিতেন নাজমুল আলম, যিনি নিজেও খুব ভালো গল্প লিখতেন। নাজমুল আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ লেখকদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, লেখক নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবু হেনাকে। তারই ফলে রেডিওতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ।

মনে আছে আমার পঠিত লেখাটির নাম ছিল 'ঊনিশ', তখন আমার বয়সটা ওই স্তরের ছিল; লেখাটি সলিমুল্লাহ হল বার্ষিকীতেও ছাপা হয়েছে। নাজমুল আলমের প্রণোদনায় পরে আমি ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক' নাটকের একটা অনুবাদ খাড়া করি, যেটি তিনি প্রযোজনা করেছিলেন। অনুবাদটি পরে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং টেলিভিশনের জন্য প্রযোজনা করেছিলেন প্রয়াত সিদ্দিক হোসেন। ভালো কথা, ঢাকায় যখন প্রথম টেলিভিশন আসে, তখন থেকেই আমার সুযোগ হয়েছে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার।

টেলিভিশন নিয়ে দুটি ঘটনা মনে আছে। দুটির সঙ্গেই আমার বড় মেয়ে খুকু জড়িত। তখন সে খুবই ছোট, সদ্য কথা বলা শিখেছে। খুকুর জন্ম ইংল্যান্ডে, সেখানে জন্মের পর থেকেই সে বিস্তর টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখেছে। কিন্তু তার বাবাকে তো সে টেলিভিশনের কাচের ভেতর আটক অবস্থায় স্বচক্ষে কখনো দেখেনি। প্রথম যখন দেখলো তখন ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল– হায় হায়, আব্বা এখন ওই কাচের ভেতর থেকে বের হবে কী করে? টেলিভিশনের ওই অনুষ্ঠানটি সরাসরি প্রচার হচ্ছিল, আমি বাসায় ছিলাম না, থাকব কী করে, আমি তো তখন স্টুডিওতে।

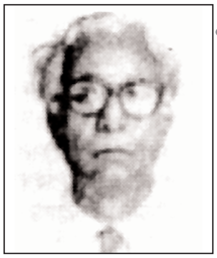

আবদুল কাদির

আবদুল কাদিরের সঙ্গে মাহফুজউল্লাহর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সম্পাদক হিসেবে আবদুল কাদির ছিলেন অসাধারণ, কোন লেখার কী দাম তিনি যেমনভাবে চোখ বুলানো মাত্র নিরূপণ করতে পারতেন, তেমন দক্ষতা আমি অন্যকারো মধ্যে দেখিনি

খুকুর মা তাকে বুঝিয়েছে যে যাকে সে দেখছে সে তার আব্বা নয়, আব্বার ছবি। কিন্তু বেচারা খুকু নাকি কিছুতেই নিরুদ্বেগ হতে পারেনি যতক্ষণ না আমাকে বাসায় ফিরতে দেখেছে।

দ্বিতীয় ঘটনা একটি অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং নিয়ে। টেলিভিশনে তখন পেশাজীবীদের নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি সিরিজ প্রদর্শিত হচ্ছিল; কয়েকটির উপস্থাপনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভার পড়েছিল আমার ওপর। বলা বাহুল্য, সেই যে গণমাধ্যমে উপস্থিতির ব্যাপারে আমার ভেতরকার আগ্রহ, সেটি আমাকে নিবৃত্ত না করে বরঞ্চ উদ্বুদ্ধই করেছিল দায়িত্বটা নিতে। এ অনুষ্ঠানও সরাসরিই প্রচার করা হতো; আসলে টেলিভিশনে রেকর্ড করে অনুষ্ঠান প্রচারের তখন কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ডিআইটি ভবনের নিচের তলায় টানাহেঁচড়া করে যে একটি মাত্র স্টুডিও তৈরি করা হয়েছিল সেটিতে ক্যামেরাও দু-তিনটির বেশি ছিল বলে মনে হয় না, আমরা তটস্থ থাকতাম সরাসরি সম্প্রচারের অনুষ্ঠানে কী না কী ভুল করে ফেলি, আর অনুষ্ঠান প্রযোজকরা তো থাকতেন রীতিমতো আতঙ্কে, উল্টাপাল্টা বক্তব্য না চলে যায়, বিশেষ করে এই জন্য যে সময়টা ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের।

সাক্ষাৎকারগুলোর একটি ছিল একজন ময়রার। ময়রার মিষ্টি মধ্যবিত্ত গৃহে কেমন জনপ্রিয় সেটা দেখিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অন্যত্র খোঁজাখুঁজি না করে প্রযোজক বুদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমাদের বাসাতেই চলে এসেছিলেন, লোকজন এবং ক্যামেরা নিয়ে। উদ্দেশ্য মিষ্টি খাওয়ারত পারিবারিক উৎসাহের কিছু ছবি তুলে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে করে এক বাক্স মিষ্টিও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। খুকু দেখছে তাদের বসবার ঘরে নানা রকমের তৎপরতা চলছে। অপরিচিত লোকজনের চলাফেরা, তারা আলো জ্বালাচ্ছে, মস্ত একটা ক্যামেরা খাড়া করছে, আসবাবপত্র স্থানচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। সে যে ভয় পেয়ে গেছে সেটা বোঝা গেলো যখন তাকে ডাকা হলো ক্যামেরার সামনে বসে মায়ের সঙ্গে মিষ্টি খেতে। কিছুতেই সে আসবে না। টেলিভিশনের লোকদের ডাকে তো নয়ই, তার মায়ের তোষামোদ, আমার হাত বুলানো, কিছুতেই কিছু হলো না। এলই না, অগত্যা ছবির প্রয়োজনে তার মাকে একাই বসে মিষ্টি খেতে হলো। আরও মজার ব্যাপার, টেলিভিশনের লোকজন যখন বিদায় নিয়েছেন, ঠিক তার পরের মুহূর্তেই দেখা গেলো আমাদের খুকু তার তিন চাকার সাইকেলটা চালিয়ে বাসাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন বীরদর্পে যেমনটা আমরা আগে কখনো দেখিনি। তখনি বুঝেছি এ মেয়ের মেরুদণ্ড শক্ত না হয়ে যায় না। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান শিউলির তখনো আগমন ঘটেনি, তার ভাবটা দেখেছি আলাদা, অতসব অনুরোধ সে মনে হয় ঠেলতে পারত না, আপোস করে ফেলত।

টেলিভিশন তখন কম জনপ্রিয় ছিল না, বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশনই তো ছিল একমাত্র চ্যানেল, তাই ওই অনুষ্ঠানটি যখন প্রচার হয়েছে তার পরদিন সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে নাজমার সহকর্মীরা হাস্যপরিহাস করে বলেছেন, 'আমাদের এখানে তো মিষ্টি স্পর্শ করতেও আপনার অনীহা, কিন্তু বাসায় তো দেখলাম দিব্যি উপভোগ করছেন।' নাজমা নাকি মিষ্টি করে হেসে বলেছে, 'বিপাকে পড়লে অনেক কিছুই করতে হয়।'

স্মরণ যখন করছিই তখন আরেকটি ঘটনার কথা বলি। আমার যেদিন বিয়ে হয় ১৯৬২-র দোসরা ডিসেম্বর। সেদিন রাতে রেডিওতে আমার একটি অনুষ্ঠান ছিল। ঘটনাক্রমে সেটিও পেশাজীবীদেরকে নিয়েই। একটি সিরিজের অংশ হিসেবে আমি কথা বলছিলাম তাঁতীদেরকে নিয়ে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তাঁতশিল্প একদিন ছিল বাংলার গর্ব ও প্রধান ভরসা। ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কারণে সেটি এখন কোন পর্যায়ে নেমেছে সেটা বোঝা যায় তাঁতীদের দুর্দশা দেখেই। তাদেরকে জোলা বলা হয়ে থাকে এবং তাদের তথাকথিত বোকামি নিয়ে নানান কল্পকথারও প্রচলন ঘটেছে। ওই অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়ায় পূর্বপাকিস্তান তাঁতী সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ স্বরে এমনটা জানিয়েছিলেন যে, তাঁতীদের আমি জোলা বলে ভীষণ অপমান করেছি। প্রতিবাদটি তারা আনুষ্ঠানিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন তখনকার গভর্নর মোনেম খানের কাছে এবং প্রতিকার দাবি করেছিলেন এই অপমানের। চিঠিটি লাটভবন এবং রেডিও অফিস হয়ে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

বিয়ের অনুষ্ঠানের রাতেই যে বেতারে আমার স্বকণ্ঠে-পঠিত কথিকা প্রচার হবে এটি আমার প্রয়াত ছোট মামাশ্বশুর জানতে পেরে উদ্যোগী হয়ে ঘটনাস্থলে একটি রেডিও এনে রেখেছিলেন যাতে আমার কথিকা শোনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনন্দ বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। এর প্রায় দুই দশক পরে আমার মেয়ে খুকুর যখন বিয়ে হয় সেদিন সন্ধ্যারাতেও টেলিভিশনে আমার একটি অনুষ্ঠান ছিল, বিতর্ক প্রতিযোগিতার। আমার বন্ধু ও সহকর্মী অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দীন আমার বিয়ে ও খুকুর বিয়ে দুটিতেই যোগ দিয়েছেন এবং খুকুর বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে তাঁর স্বাভাবিক তেজস্বী কণ্ঠেই ঘোষণা দিয়েছেন। 'কী রকম যোগাযোগ, আপনার বিয়েতে রেডিও টক আর আপনার মেয়ের বিয়েতে আসার সময় দেখে এলাম আপনার টেলিভিশন শো। দেখছি অব্যাহতির কোনো উপায় নেই।' বেতার টেলিভিশনে আমার এই আগ্রহের কারণ কি অন্তর্গত আত্মপ্রেম- হবেও বা, কিছুটা আত্মপ্রেম তো ছিল? নিশ্চয়ই, আমি বলছি, বিশ্ব শুনছে, অহমিকার পুষ্টি সাধনে এই বোধটার অবদান সামান্য নয়। সুখের কথা, এ মোহ ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে।

এখনো বোধ করি সে রকমই আছে, থাকবারই কথা, সেটা হলো রেডিওতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আগে শিল্পীকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো; একদিকে শিল্পী, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির হয়ে বেতারকেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক, মাঝখানে অনেকগুলো শর্ত; চুক্তিপত্রের ধরনটা ছিল এই রকমের। বোঝা যায় রাষ্ট্রের দিক থেকে বেতার কতটা গুরুত্ববহ এবং স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান ছিল। বেতারের যে কত শক্তি সেটা যুদ্ধের সময়ে বোঝা যায়, যেমন বুঝেছি আমরা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে; টের পাওয়া যায় শান্তির কালেও, যেটা আমাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে পাকিস্তানি শাসনামলে যখন বাংলা ভাষাকে বিকৃত করা, রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধকরণ এসব তৎপরতা তো ছিলই, শুনতে হয়েছে আইয়ুব খানের কণ্ঠ, ইয়াহিয়া খানের মাতলামো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করার অনেকগুলো সুবিধার মধ্যে একটি ছিল বেতার, টিভি ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ। ছাত্রজীবনে আমি গল্প লিখতাম। বেশির ভাগ গল্পই ছাপা হয়েছে মাসিক' 'মাহেনও'তে। অনেক দিন পর, সেও অবশ্য বছর পাঁচেক হয়ে গেল, আমার পুরনো ও নতুন গল্প মিলিয়ে একটি বই বের হয়েছে, 'ভালোমানুষের জগৎ' নাম দিয়ে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন 'মাহেনও'-এর সম্পাদক হিসাবে কলকাতা থেকে এসে যোগ দিয়েছেন কবি আবদুল কাদির। তাঁর সম্পর্কে তো আগে থেকেই জানতাম, সামনাসামনি যোগাযোগটা ঘটল আমার বন্ধু ও সহপাঠী মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর মাধ্যমে। আবদুল কাদিরের সঙ্গে মাহফুজউল্লাহর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সম্পাদক হিসেবে আবদুল কাদির ছিলেন অসাধারণ, কোন লেখার কী দাম তিনি যেমনভাবে চোখ বুলানো মাত্র নিরূপণ করতে পারতেন, তেমন দক্ষতা আমি অন্যকারো মধ্যে দেখিনি। তাঁর মনে হয় ধারণা ছিল আমি একজন গল্পলেখকই হবো এবং হওয়া উচিতও। সে লাইনে না-গিয়ে আমি পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে বেড়াচ্ছি এটা দেখে একই সঙ্গে হতাশ এবং বিরক্ত দুটোই হয়েছিলেন, এবং আমাকে সেটি জানিয়েছেন, মাহফুজউল্লাহর মারফতে। কিন্তু আমি মনে হয় মোহে পড়েছিলাম সহজ জনপ্রিয়তার, যে জন্য কথা-সাহিত্যিক হবার জন্য যে শ্রম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের যে আবশ্যকতা থাকে সেদিকে এগুতে পারিনি। কিশোর বয়সে আমি যে হাতেলেখা পত্রিকার ব্যাপারে অতটা

উৎসাহী ছিলাম তার অন্য একটি তাৎপর্য এখন পরিষ্কার দেখতে পাই। সেটি হলো মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা। জয়ন্তানুজের যে লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেখানে তিনি বলছেন, সাতচল্লিশ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর নিজের গ্রামে বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য নিজের দুঃসাহসিক উদ্যোগে তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ওই কাজের সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশে আমার ব্যস্ততার তুলনা করলে বুঝতে পারি আমার জন্য বিচ্ছিন্নতা কত বড় সত্য ছিল। জয়ন্তানুজ গ্রামের কৃষক মজুর হিন্দু মুসলমান সবার সঙ্গে মিশতে চাইতেন, নৈশ বিদ্যালয়টি ছিল একাধারে তাঁর আগ্রহের প্রতীক ও আগ্রহকে বাস্তবায়িত করবার সুযোগ। কৈ আমার ক্ষেত্রে তো তেমনটি ঘটেনি। আমি তো হাতেলেখা পত্রিকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছি ছোট্ট একটা গণ্ডির ভেতর; ওই গণ্ডিতেও কথাসাহিত্য রচনার জন্য বিষয়বস্তু খুঁজে পাবার ছিল বৈকি, কিন্তু গভীরে যাবার জন্য যে ঐকান্তিকতা প্রয়োজন সেটা তো আমার ভেতর ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়াতে কৃষক ও শ্রমিকের মোটেই সুবিধা হয়নি, কিন্তু মধ্যবিত্তের কিছুটা হয়েছে, যে জন্য আমরা নানা ক্ষেত্রে খুব একটা পরিশ্রম না-করেই কল্কে পেয়ে গেছি।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য চাকরি পাওয়াটাও তখন এখনকার মতো কঠিন ছিল না। বিশেষ করে কলেজ ও স্কুলে। দেশ-ভাগের সময়ে এবং পরে অনেক শিক্ষকই চলে গেছেন, বিশেষত তাঁরা যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ওটা খুবই সত্য কথা, সবাই মানতে চান না, কিন্তু এই যে আমরা একবার নয়, দুই-দুইবার স্বাধীন হলাম, এই দুইবারই দেশ থেকে মেধাপাচার ঘটেছে। প্রথমবার হিন্দুরা অনেকে চলে গেলেন, দ্বিতীয়বার গেলেন মেধাবান তরুণদের একটা বড় অংশ, যারা কেউ গেলেন বিদেশে পড়তে, কেউ চাকরি করতে। কিন্তু আর ফিরতে পারলেন না। দ্বিতীয়বারের হিসাবটা পরে করা যাবে, তবে প্রথমবারে হিন্দু শিক্ষিকদের মধ্য থেকে বহুজনের চলে যাওয়ায় ক্ষতি হলো গোটা শিক্ষাব্যবস্থার; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে, একের প্রস্থানে অপরের স্ফীতি, এখানেও তেমনি লাভ হলো মুসলিম মধ্যবিত্তের। আগেই বলেছি, দেশে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে ওই একটি সবেধন নীলমণি এবং তার ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাই পাস করে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পাওয়া গেছে। কলেজগুলোতে ইংরেজি শিক্ষকের অভাব হিন্দু শিক্ষকদের দেশত্যাগজনিত কারণে ঘটেছে তো বটেই, সিভিল সার্ভিসের দুর্দমনীয় আকর্ষণে অনেকের চলে যাওয়ার দরুনও না-ঘটে পারেনি।

স্থান শূন্য হবার সুবিধাটা আমিও পেয়েছি, এমএ পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই বেশ কয়েকটা কলেজের যেকোনো একটিতে যোগ দিতে পারি, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এদের মধ্যে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজই পছন্দ হলো। একাধিক কারণে। প্রথমত কলেজটির ততদিনে বেশ নাম হয়েছে। দ্বিতীয়ত মুন্সিগঞ্জ আমার কিছুটা চেনা, ওটি আমাদের মহকুমা শহর, সেখানে আমি একবার থেকেও এসেছি, একদিনের জন্য হলেও; তাছাড়া সেখানে আত্মীয় হিসাবে দাবি করা যায় এমন পরিবারও ছিল দুয়েকটি। মুন্সিগঞ্জ ঢাকা থেকে কাছেও। আর আছে নদী, যা আমাকে সব সময়েই টানে। হরগঙ্গা কলেজে আমার ঠিক আগে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত, তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়াতে জায়গাটা খালি হয়েছিল। তাছাড়া কলেজে তখন বিএ খুলেছে, যে জন্য ইংরেজির একজন অতিরিক্ত শিক্ষকও প্রয়োজন। আমরা দুই সহপাঠী, শাহ জামান এবং আমি একই সঙ্গে যোগ দিয়েছি কলেজে। থাকবার চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল কলেজ প্রাঙ্গণেই, একটি বাড়িতে। কলেজে দর্শন পড়াতেন আবদুর রাজ্জাক, তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম। গিয়ে দেখা পেলাম বাংলার অধ্যাপক আলীমুজ্জামান চৌধুরীর। চমৎকার আবৃত্তি করতেন এবং অনেক বাংলা কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। ভালোবাসতেন গল্প করতে। তাঁর সুনাম আগে থেকেই শুনেছিলাম, সাক্ষাতে বুঝলাম সুনামের তিনি যোগ্য বটে। ফলে মুন্সিগঞ্জে যে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম, চমৎকার কেটেছে। গল্পগুজবে, নদীর ধারে এবং গ্রন্থাগারে পুরাতন পত্রিকা পাঠে। জামান আর আমি মুন্সিগঞ্জে যাবার-আসবার পথে নারায়ণগঞ্জের বোস কেবিনে নির্ভুলভাবে পরোটা ও মোহনভোগের দ্বারা নিজেদেরকে আপ্যায়িত করতাম। কিন্তু মুন্সিগঞ্জ ছিল একটি সীমিত শহর। একদিকে এখানে কোনো শিল্পকারখানা ছিল না, অন্যদিকে এ শহর বিচ্ছিন্ন অন্য জনপদ থেকে। এখন কেমন আছে জানি না।

কয়েক সপ্তাহ পরে এবং মুন্সিগঞ্জে বসবাস একঘেয়েমির দ্বারা আক্রান্ত হবার আগেই আমি চলে এসেছি জগন্নাথ কলেজে, আবার সেই সদরঘাটের ধারে। জগন্নাথ কলেজ তখন আয়তনে ও ছাত্রসংখ্যায় মস্ত বড়। দিনে ক্লাস হয়, রাতেও চলে কয়েক ঘণ্টা, বিশেষ করে বয়স্ক ছাত্রদের জন্য। বয়স্ক ছাত্রদের তুলনায় নবীন ছাত্রদের ভেতরেই প্রাণচাঞ্চল্য ছিল অধিক। এক সময়ে কলেজের বদনাম ছিল বিশৃঙ্খলার জন্য। ছাত্ররা ক্লাসের ভেতরই হৈ চৈ করত, নানা রকমের হাঁকডাক ছাড়ত, একটা আওয়াজ ছিল বেশ পরিচিত, ঘি-ও-ও,' বেশ প্রলম্বিত আকারে হাঁকত পেছনের বেঞ্চ থেকে। একবার এমনকি মুনীর চৌধুরীর ক্লাসে, তিনি অল্প কিছুদিন ওই কলেজে ইংরেজি পড়িয়েছেন, সেই 'ঘি-ও-ও' ধ্বনিটি দিতে কারা যেন চেষ্টা করেছিল, মুনীর চৌধুরী তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে পেছনের বেঞ্চ থেকে একজনকে ডেকে সামনে নিয়ে এসে বলেছেন, 'ঘিও' সম্পর্কে পাঁচ মিনিট ইংরেজিতে বক্তৃতা না দিলে তাকে তিনি ছাড়বেন না। সেই ছেলেটি দুর্বৃত্তদের একজন ছিল কি না তা তিনি জানতেন না, জানার প্রয়োজন আছে বলেও ভাবেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই বাণীটি পৌঁছে দেয়া যে ওসব কাণ্ড অন্তত তাঁর ক্লাসে চলবে না। চলেওনি। অন্য ক্লাসেও থেমে গিয়েছিল। আমি যখন যোগ দিয়েছি কলেজ তখন অনেক শান্ত। দুষ্টমিটা যারা করত তাদের পরিচয় ছিল কলতাবাজারের ছেলে। কলতাবাজারে ভদ্রজনেরাও থাকতেন, কিন্তু শিক্ষায় আগ্রহ কম এবং মস্তানিতে উৎসাহী এমন ছেলেপেলেও ছিল। কলেজ যে শান্ত হয়েছিল তার কারণ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের জয়। পরে মোনেম খানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে মস্তানরা আবার সবল হয়েছে। মস্তান শব্দটা অবশ্য পরবর্তী, তখন এদের নাম ছিল গুণ্ডা।

পরবর্তী সময়ে এই কলেজের বেশ কয়েকজন সাবেক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যারা সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং স্মরণ করতে দ্বিধা করেনি যে অল্পদিনের জন্য হলেও আমি তাদেরকে পড়িয়েছি। সেবার মেলবোর্নে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। এক সন্ধ্যায় স্থানীয় বাঙালিরা একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশের আয়োজন করে, আমরা যারা বাইরে থেকে গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। একজন প্রবীণ ভদ্রলোক দেখি আমার পা ছুঁয়ে সালাম করতে উদ্যত। বললেন, আমার ছাত্র ছিলেন জগন্নাথ কলেজে, তাঁকে কোনোমতে নিবৃত্ত করা গেল, কিন্তু তিনি দেখলাম তার স্ত্রী, সন্তান ও নাতি-নাতনীদেরকে সবিস্তারে জানাচ্ছেন এককালে যে আমার ছাত্র ছিলেন সেই সুসংবাদ। ঢাকায় পথে-ঘাটে অবসরপ্রাপ্ত কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে, জানিয়েছে আমার ছাত্র ছিল জগন্নাথে। বুঝতে পারি কলেজটা তখন ছিল বিশাল এবং আমি নিজেও অনেকটা সময় পার হয়ে এসেছি, ইতিমধ্যে।

কলেজে চাকরি পেয়ে কিছুটা স্বাধীনতা এল, দুদিক থেকে; প্রথমত অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়ত অবস্থানগত; ওই প্রথম আমার পিত্রালয় থেকে বের হয়ে আসা। আগে আয়ের উৎস ছিল স্কলারশিপ, সেটা মোটেই বড় অঙ্কের নয়, কিন্তু জগন্নাথ কলেজে পেতাম ২৭৫ টাকা, বেতন আড়াই শ' আর দু'দিন সন্ধ্যাকালীন ক্লাস নেবার জন্য পঁচিশ। সব মিলিয়ে বেশ ভালো অঙ্ক তখনকার হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি যখন পেলাম তখন কিন্তু বেতন পঁচিশ টাকা কমে গেলো; বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারেরাও শিক্ষা শুরু করতেন ওই আড়াইশ'তেই। থাকার সুবিধাজনক জায়গার অভাব ছিল তখন ঢাকা শহরে; বিয়ের পরে বাসা ভাড়া করার আগ পর্যন্ত আমাদের হাসান ভাই (অর্থাৎ হাসান হাফিজুর রহমান) থাকতেন নিমতলীর একটি হোটেলে কামরা ভাড়া করা। আমাকে অবশ্য অতটা করতে হয়নি, আমার ফুপাতো ভাই আবদুল মোমেন বয়সে আমার সামান্য বড় হলেও একাধারে বন্ধু ও মুরব্বি ছিলেন। তার পরিচালনায় প্রথম থেকেছি পুরাতন কোর্ট হাউজ স্ট্রিটে এবং পরে রথখোলার মোড়ে। প্রথম আবাসটি ছিল আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা কোরবান আলীর ওকালতির জন্য ব্যবহৃত চেম্বার, যেটি তিনি তখন আর ব্যবহার করতেন না, রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকার কারণে; দ্বিতীয়টি ছিল রথখোলার ঠিক মোড়ে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ির ওপরতলা; তার নিচের তলায় ছিল একটি ছাপাখানা, ওপরে থাকবার মতো দুটি ঘর ও রান্নার ব্যবস্থা। প্রয়াত কবি তালিম হোসেন ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ, তিনি বাসস্থান বদলাতেন এবং সম্ভব হলে বিষয়সম্পত্তি ক্রয় করতেন, যে অভ্যাসটা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন বলে দাবি করতেন। তাঁর পিতা একাধারে ছোটখাটো জমিদার ছিলেন নওগাঁ অঞ্চলে এবং কবিতাও লিখতেন অবসর সময়ে, তালিম ভাই উদ্যোগ নিয়ে তাঁর পিতার একটি কাব্য সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন, চমৎকার মুদ্রণ ও

প্রচ্ছদসহ, নাম ছিল ‘নকশা’। তালিম ভাই রথখোলা মোড়ের ওই ছাপাখানাটি কিনেছিলেন, ওখান থেকেই মাসিক ‘দ্যুতি’র শেষ দুটি সংখ্যা ছেপে বের করেছিলাম মনে আছে আমার। ওপরের তলায় তালিম ভাই নিজে সপরিবারে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাসা হিসাবে সেটি প্রশস্ত ছিল না, যে জন্য তিনি স্বামীবাগ এলাকায় সামনে বাগানওয়ালা একটি বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বামীবাগে চলে গেলে আমার অভিভাবকসুলভ ভ্রাতার ব্যবস্থাপনায় রথখোলার বাসগৃহটিতে আমরা আশ্রয় নিই।

অজিত কুমার গুহ

শিক্ষকদের মধ্যে অজিত কুমার গুহের সঙ্গে প্রথম দিনেই সাক্ষাৎ। বলেছিলাম, ‘স্যার চিনতে পারছেন? জবাবে যা বলেছিলেন সেটা বোধ করি শিক্ষকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। বলেছিলেন, ‘পুরানো ছাত্রদেরকে কি ভোলা যায়?’

অধ্যাপনা তখন আমার বেশ ভালো লাগছে। আমি বক্তৃতা করছি, চকচকে চোখ ছেলেরা শুনছে, এই ব্যাপারটার মধ্যে বীরত্বের যে একটা অনুভব ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না তো। এমনিতে আমার সুনাম আছে লাজুক বলে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনে হয় আকাঙ্ক্ষা ছিল বীর হবার। আত্মপ্রেম বীরত্বেরই অনুষঙ্গ বটে। জগন্নাথ কলেজের গ্রন্থাগারটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, একাত্তরে যেটি হানাদারেরা বলতে গেলে ধ্বংস করে দেয়। সেখান থেকে বই পাওয়া; সুযোগ পেলে চলে যাওয়া সদরঘাটে সেই সময়েই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী পত্রিকা ‘সমকাল’ বের হয় হাসান ভাই ছিলেন সহযোগী সম্পাদক সে-পত্রিকায় আমি তো লিখেছিই, হাসান ভাইয়ের সঙ্গে পটুয়াখালর যে ছাপাখানায় পত্রিকাটি ছাপা হতো সেখানেও গেছি মাঝেমধ্যে। আরো একটি কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলাম আমরা। সেটিও আমার ওই প্রায় অভিভাবক মোমেনের নেতৃত্বেই। তখন আমাদের অনেক উৎসাহ, প্রচুর উদ্দীপনা।

সমরাসী কয়েকজন তরুণও থাকে আশপাশে। যাদের পৈতৃক ঠিকানাগুলো কাছাকাছি নদীর ওপারে, বিক্রমপুরে। ঠিক হলো একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে, যার নাম হবে, বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক সংঘ, আমি যার সম্পাদক হবো। কিন্তু আসল দায়িত্ব থাকবে মোমেনের যিনি হবেন সাংগঠনিক সম্পাদক, আর সভাপতি হবেন মঈদ-উর রহমান, যিনি আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়, এবং যোগ দিয়েছেন মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসেবে। মঈদ ভাই তখন খুব সুন্দর গল্প লিখতেন, তাঁর প্রথম গল্পসঙ্কলন ‘ময়ূরের পা’ নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন মীজানুর রহমান, মঈদ ভাইয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মঈদ ভাই পরে আমেরিকায় চলে যান, ইচ্ছা নিশ্চয়ই ছিল ফিরে আসবেন, কিন্তু তাঁর আর ফিরে আসা হয়নি। মঈদ-মীজানের জুটিটা ছিল ঈর্ষণীয়। দুই ভাই ভীষণ বন্ধু। এবং পত্রিকা প্রকাশে অত্যন্ত আগ্রহী। কলকাতায় থাকতে, দু’জনে মিলে ‘ঝংকার’ নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বের করতেন, ঢাকায় এসে একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন, ‘ঝংকার’কে ছেপে বের করা শুরু করে দিলেন। ওই পত্রিকায় আমিও লিখেছি। কিন্তু সেটিকে তারা দীর্ঘজীবী করতে পারেননি। করাটা সম্ভব ছিল না। পরে দু’ভাই মিলে ‘রূপছায়া’ নাম দিয়ে একটি সিনেমা মাসিক বের করেন। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতা পার হয়ে মীজানুর রহমান বের করলেন ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা’। যেটির বিষয়ে আমরা অনেকেই জানি, এবং জানি এটাও যে মীজান এখন আর নেই, সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন।

সেই সময়ে এই দুই ভাইকে আমরা এক সাথে পেয়েছি বিক্রমপুরে সাংস্কৃতিক সংঘের কাজের ভেতর। ঠিক হলো একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে, বিক্রমপুরের শিল্পীদেরকে নিয়ে। স্থান বার লাইব্রেরি হল। সেই সময়ে ছায়ানাটক জিনিসটা খুব চালু ছিল। মঞ্চের সামনে বড় একটা সাদা পর্দা টানানো থাকত, সিনেমা হলে যেমনটা থাকে। পেছন থেকে হারিকেনের আলোর সাহায্য নিয়ে ছায়া হতো পর্দায়, তাতে অভিনয়, গান, সংলাপ, আবৃত্তি, ধারাবিবরণী সব থাকত, দৃশ্যপটও তৈরি করা হতো ডালপালা ও কার্ডবোর্ডের সাহায্যে। মীজান ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র, তবে ছাত্রত্ব চালু রাখতে পারেননি চোখের অসুবিধার কারণে; কিন্তু তার শিল্পবোধ ছিল উঁচুমানের, আর মঈদ ভাই চিকিৎসক হলেও ভেতরে ভেতরে ছিলেন একজন শিল্পী। ছায়ানাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম আমি, তাতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন ওঁরা দুই ভাই, ধারাবিবরণী পড়বার দায়িত্ব ছিল আমার। ছায়া নাটকের নাম ইছামতি; নদীর কাহিনী। ইচ্ছামতি বিক্রমপুরের নিজস্ব নদী। এই নদী ইতিহাস দেখেছে, জনপদকে সজীব রেখেছে, দেশভাগ সহ্য করেছে এবং এখন শুকিয়ে যাচ্ছে- অবজ্ঞায় অবহেলায়, বিষয়টি এ রকমের। মূল কারণটি যে পুঁজিবাদের নাড়াচাড়া, এবং সেই তৎপরতার দরুনই যে মঈদ ভাইকেও অচিরেই আমেরিকায় চলে যেতে হবে, এবং যাবার পরে তিনি আর ফিরে আসবার পথ খুঁজে পাবেন না, সেটা তখনও বুঝিনি এবং প্রতিকারের পথ যে কি তাও জানা ছিল না, জানাতেও পারিনি। কিন্তু আমাদের শ্রমে ও উপস্থাপনায় নদীর মর্মবেদনাটি যে বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেটা টের পাওয়া গেছে দর্শকদের সাড়া দেয়া দেখে। নদীর সমস্যাটা যে আঞ্চলিক নয়, সর্বজনীন বটে, এই সত্যটাও আমাদের ওই উপস্থাপনায় ধরা পড়েছিল।

জগন্নাথ কলেজে আমার চাকরি সর্বমোট নয় মাস তিন সপ্তাহের। কলেজের শিক্ষকদের ভেতর দলাদলি ছিল, সব কলেজেই যেমন থাকে, তবে বড় কলেজ বলে দলাদলির মাত্রাটাও ছিল বড়, মতাদর্শগত নয়, নিতান্তই স্বার্থকেন্দ্রিক। আমরা সে সবের সঙ্গে যুক্ত হইনি, আমার কাজ ছিল ক্লাস নেয়া, কমনরুমে হাসান ভাই, ইংরেজির আবদুল মতিন ও শৈলেন ভদ্রের সঙ্গে গল্প করা এবং কমনরুমের রক্ষক ধীরেনের হাতে তৈরি অতিউপাদেয় বাটারটোস্ট সহযোগে চা পান করা। শিক্ষকদের মধ্যে অজিত কুমার গুহের সঙ্গে প্রথম দিনেই সাক্ষাৎ। বলেছিলাম, ‘স্যার চিনতে পারছেন? জবাবে যা বলেছিলেন সেটা বোধ করি শিক্ষকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। বলেছিলেন, ‘পুরানো ছাত্রদেরকে কি ভোলা যায়?’

১৯.

আমি আশা করছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাব। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন পদ সৃষ্টি হতো কালেভদ্রে, চলমানতা যেটুকু সেটা

The Daily Star is looking for part time and full time recruits and contributors for the Star Insight, a fortnightly publication and for an upcoming supplement.

Candidates must be fluent in both English and Bangla and must have a good command over written English.

Minimum Requirement: Candidates must be over 18 years of age and must have completed their GCE O' Levels or be university students or fresh graduates. Interested candidates are requested to provide full C.V. with contact information and 2 photographs to:

Rafi Hossain,
In-charge of Star Insight and
Coordinator of The Daily Star Reader's Club.
19, Karwanbazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone: +88-02-8124944, 8124966, 8124955
Fax: +88-02-8125155

বিদ্যমান পদগুলোর ভেতরেই ঘটত। দেশভাগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েও শূন্যতা এসেছিল, কেউ কেউ চলে গেছেন ভারতে, কেউ গেছেন বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য, শূন্যস্থান পূরণ হয়েছে দু'ভাবে– কলেজ থেকে- আসা শিক্ষকদের নিয়ে এবং ভালো রেজাল্ট-করা তরুণদেরকে সুযোগ দিয়ে। সেই তরুণরাও অনেকে থাকতেন না, সিভিল সার্ভিসের আকর্ষণ ছিল দুর্দমনীয়, রাষ্ট্র ডাক দিত এবং হস্তগত করে নিয়ে অনুগত সেবকে পরিণত করে তবে ছাড়ত। ইংরেজি বিভাগে অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন মুজিবুল হক, তিনি চলে গেলেন সিভিল সার্ভিসে; তাঁর জায়গায় এলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, যিনি আমাদের দু'বছর ওপরের ছাত্র ছিলেন, যাঁর সঙ্গে আমাদের এক ধরনের বন্ধুত্বই ছিল, তিনিও যখন চলে গেলেন তখন যে জায়গাটা খালি হলো সেখানেই আমার প্রবেশ। সেই যে প্রবেশ করলাম আর নড়িনি, এখনও রয়ে গেছি, নতুন এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে।

আমার আব্বা অনেক দেরিতে পুরনো ঢাকায় কোনোমতে ছোটমাপের একটি বাড়ি তৈরি করতে পেরে বেশ আশ্বস্ত হয়েছিলেন বাড়ির নাম দিতে চেয়েছিলেন সেল্টার; বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরিটাকেও ঠিক ওভাবেই দেখেছি আমি, আশ্রয় হিসেবে। ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর আমি সলিমুল্লাহ হলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটরের পদও পেয়ে যাই, যাতে হলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেশ প্রশস্ত একটি বাসগৃহ মিলে যায়। পাস করে আমার মেজভাই যোগ দিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে; বাসা পেয়েছিল আমার বাসার উল্টো দিকে, রাস্তার অপর পারে। বিশ্ববিদ্যালয় তো আমার খুবই চেনা, ১৯৪৮ থেকেই আমরা এর আশপাশে বসবাস করছি। কার্জন হলের ইকবাল দিবসের এক অনুষ্ঠানে মুনীর চৌধুরীর ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছি, সেখানে তিনি উর্দু বিভাগের প্রধান আন্দালীব সাদানীর চ্যালেঞ্জ নীরবে গ্রহণ করে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাষায় উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রে ইকবালের আস্থাটা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে কলাভবনের আমতলায় আমিও ছিলাম, কাঁদানে গ্যাসের ভুক্তভোগী হবার প্রথম অভিজ্ঞতা ওইদিনই হয়। প্রতিবছর সলিমুল্লাহ হলে নির্বাচন উপলক্ষে যে উৎসব হতো তার স্পর্শ পেয়েছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর প্রথম বছরেই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেছি প্রার্থী হিসেবে, যখন আমি শিক্ষক তখন ছাত্রদের অনেকের সঙ্গেই আমার সখ্য; আমার ক্লাসেই উপস্থিত থাকত আমার ফুপাতো ভাই মুজিব, যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। আইএ পরীক্ষা দেবার পর যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ওই কাজ তার নয় টের পেয়ে চলে এসে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করেছিল। (কাকুলে তার ব্যাচমেটদের মধ্যে ছিলেন জিয়াউর রহমান ও সফিউল্লাহ) শিক্ষকদের ভেতর অনেকের সঙ্গেই আমার জানাশোনা ছিল, অন্তরঙ্গ ছিলাম দু'জনের সঙ্গে, একজন স্ট্যাটিসটিকসের এম ওবায়েদুল্লাহ, অপরজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাহফুজুল হক।

দুজনেই বয়সে আমার চেয়ে বড়, কিন্তু সে পার্থক্যটা মনে থাকত না, যখন দেখা সাক্ষাৎ ঘটত, এবং ঘটত তা ঘনঘনই। ওবায়েদুল্লাহ সুপরিচিত ছিলেন আসকার ইবনে শাইখ নামে; আজিমপুর কলোনিতে তো সরকারের সববিভাগের লোকেরাই থাকতেন, টিকটিকি বিভাগেরও একজন ছিলেন যাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর চোখ রাখার; আসকার ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা আছে তা তিনি জানতেন, সেই জন্য একদিন, তখনও আমি ছাত্র, আমার শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা ওই যে আপনাদের আসকার ইবনে শাইখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তালিকায় ওই নামের তো কেউ নেই? ওঁর আসল নামটা কি?' আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন জানতে চান, তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই, তাঁর কর্তব্যই হচ্ছে শিক্ষকদের বিষয়ে অবহিত থাকা। বুঝেছিলাম যে রাষ্ট্রের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমাত্রেই ছিলেন সন্দেহভাজন- ব্রিটিশ আমলে ছিলেন, স্বাধীন পাকিস্তান আমলে তো খুবই ছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে একাত্তরে, এবং এখনো যে আছেন তার নিদর্শনেরও অপ্রতুলতা নেই।

আসকার ভাই-এর নাম সংস্কৃতিসেবী মহলে সবাই জানত। কারণ তিনি নাটক লিখতেন, পরিচালনা করতেন; তার নাটক বই হয়ে বের হয়েছে; মঞ্চে, রেডিওতে, এবং পরে টেলিভিশনে অভিনীত হয়ে প্রচুর পরিমাণে। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগের স্বতন্ত্র একটা ক্ষেত্র ছিল, সেটা হলো পত্রিকা সম্পাদনা। 'দ্যুতি'র তিনি সম্পাদক ছিলেন, আমি ছিলাম সহযোগী। মাহফুজুল হক ছিলেন আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। আমি যখন এমএ ক্লাসে পড়ি তখন তিনি লেকচারার হয়েছেন; এবং তাতে আমার অনেক সুবিধা একটি ছিল এই যে তার কার্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে বই তুলে বাসায় আনা যেত। এঁরা দু'জনই তখনকার ইকবাল হলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আসকার ভাই হাউজ টিউটর আর মাহফুজুল হক এ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটর; এতে তাঁদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছিল, আর আমাদের জন্য সুযোগ এসেছিল তাঁদের বাসায় গিয়ে আপ্যায়িত হবার। মাহফুজুল হকের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম ওরফে খুকির আতিথেয়তা ছিল একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বদাই হাসিখুশি।

মাহফুজুল হক নিজে লিখতেন, এবং 'ইংগিত' নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করতেন, যেটিতে আমার সুযোগ হয়েছে লিখবার, তাঁর কারণেই। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাজনীতিমনস্ক ছিলেন তিনি। কিশোর বয়সে চট্টগ্রামে যুক্ত ছিলেন মুকুল ফৌজের সঙ্গে, আনোয়ারা ভাবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ওই সংগঠনের মাধ্যমেই। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। ১৯৫৪ সালে লীগ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রচারকার্যে তাঁর নিষ্ঠা আমি দেখেছি; চট্টগ্রাম জেলা যুক্তফ্রন্ট কমিটির সম্পাদক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। মাহফুজুল হক তাঁর উৎসাহটাকে অনায়াসে অন্যের ভেতর সংক্রমিত করতে পারতেন। আমি তাঁর ওপর এতটাই নির্ভরশীল ছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় চাকরিতে এ্যাডহক পর্যায় থেকে নিয়মিত পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলাম তাতে যে দুজন রেফারির নাম উল্লেখ করতে হয়েছিল তাঁদের একজন ছিলেন তিনি, যা নিয়ে পরে আমাকে এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে লেকচারার পদের প্রার্থী হিসাবে আমি এমন একজনকে সাক্ষী মেনেছি যিনি নিজে সবেমাত্র এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর হয়েছেন। আমার দিক থেকে কাজটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত মনে হয়নি, হলে তো সেটা করবার কথা নয়।

১৯৫৯-এ লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ মাসের স্নাতকোত্তর একটি কোর্স করার জন্য আমি একটি বৃত্তি পাই। এ ধরনের বৃত্তি তখন দেওয়া হচ্ছিল। আমেরিকানরাই বেশি হারে দিত, ফুলব্রাইট রকফেলারসহ নানা সরকারি বেসরকারি আয়োজন ছিল তাদের, ব্রিটিশদের তৎপরতাটা সে-তুলনায় সীমিত ছিল বলতে হবে। ওই কোর্সে যোগ দেবার জন্য যে সকালে আমি বাসা থেকে রওনা দেব, তার আগের মুহূর্তে দেখি মাহফুজুল হক তাঁর ইকবাল হলের বাসা থেকে সলিমুল্লাহ হলে আমার ডেরাতে এসে উপস্থিত। বললেন, 'এয়ারপোর্টে যাওয়া হবে না। তবে আমার শুভেচ্ছা রইল।' আমি জানতাম শুভেচ্ছাটা ছিল আমার সঙ্গে, সর্বক্ষণ। দশমাস পরে যখন ফিরে আসি তখন কী খুশি হয়েছিলেন তিনি, হয়েছিলাম আমিও, যেন পূর্ব জীবন ফেরত পেলাম, মনে হয়েছিল। খুশি হয়েছিলেন আসকার ইবনে শাইখও; তিনি তো একটি ভোজেরই আয়োজন করে ফেললেন তাঁর বাসায়, খাসি জবাই দিয়ে।

কিন্তু মাহফুজুল হকের সান্নিধ্য আমি যেমনভাবে পাব বলে আশা করেছিলাম সে-ভাবে পেলাম না। কেননা ঠিক এর পরের বছরই তিনি সপরিবারে চলে গেলেন নিউইয়র্কে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। চার বছর পরে ফিরলেন যখন তখন অবশ্য কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটল; কেননা তাঁরা বাসা পেলেন নীলক্ষেত এলাকায় আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তারই কয়েকটি ফ্ল্যাটের একটিতে। আমরা নিকট প্রতিবেশী হয়ে গেলাম। নাজমার সঙ্গে মাহফুজুল হক ও আনোয়ারা ভাবীরও এমনই খাতির জমল যেন তারা কতকালের পরিচিত। সময়টা ১৯৬৪, আইয়ুব খানের রাজত্ব চলছে; কিন্তু মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে, বাষট্টিতে সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে গেছে, যেটা আমরা সামনে থেকেই দেখেছি। ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশি তৎপরতা কেমন অশ্লীল রূপ নিতে পারে সেটা আমাদেরকে সরাসরি দেখতে হয়েছে পুরাতন কলাভবনের (এখন যা মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সি বিভাগের অংশ) দোতলায় দাঁড়িয়ে।

একটি দৃশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিষণ্ন ও লজ্জিত করেছিল। সেটা হলো এই যে পুলিশ বাহিনীর কর্তা হিসাবে সেদিন যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি আমাদেরই এক বন্ধু। কিছুদিন আগে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন; এককালে তিনি কবিতা লিখতেন; পড়তেন অর্থনীতিতে, আমাদের দু'বছর ওপরে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ সার্ভিস পেয়েছেন এটা জানতাম; কিন্তু তাঁকে যে ওই মূর্তিতে ওই পোশাকে কর্তব্যরত অবস্থায় দেখতে হবে সেটা কস্মিনকালেও ভাবিনি। তাঁর নাম না হয় না-ই করলাম, কেননা আজ তিনি প্রয়াত; পরবর্তীতে পুলিশ বিভাগের অতি উচ্চপদ পেয়েছেন জানতাম, আমাদের বাসাতেও একবার এসেছিলেন, সামাজিক সাক্ষাৎকারে। কলাভবনের দোতলার উত্তর দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের নির্জন রাস্তায় তাঁকে যে পোশাকে ও ভঙ্গিতে দেখলাম তাতে তিনি কতটা লজ্জা পাচ্ছিলেন জানি না, কিন্তু আমরা যারা তাঁকে চিনতাম তাঁরা যে পেয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাষ্ট্র যে কতটা নির্মম ও অমানবিক হতে পারে আমাদের ওই বন্ধুর দুর্দশা দেখে সেদিন নতুনভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

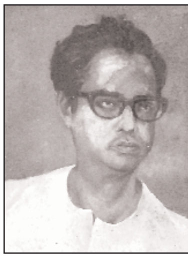

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে পেছনের বেঞ্চ থেকে একজনকে ডেকে সামনে নিয়ে এসে বলেছেন, 'ঘিও' সম্পর্কে পাঁচ মিনিট ইংরেজিতে বক্তৃতা না দিলে তাকে তিনি ছাড়বেন না। সেই ছেলেটি দুর্বৃত্তদের একজন ছিল কি না তা তিনি জানতেন না, জানার প্রয়োজন আছে বলেও ভাবেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই বাণীটি পৌঁছে দেয়া যে ওসব কাণ্ড অন্তত তাঁর ক্লাসে চলবে না

কিন্তু এটা আমি নিশ্চিত জানি যে, মাহফুজুল হক, যিনি আমাদের ওই পুলিশি কর্তব্যরত বন্ধুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তিনি কখনো ওই রকমের দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হতে সম্মত হতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হলে তিনি সাংবাদিক হতেন, রাজনীতিকও হতে পারতেন, কিন্তু যাই হোন খ্যাতিবান যে হতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চৌষট্টিতে দেশে ফিরে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য একটি সংগঠন গড়তে, নাম দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান বাংলাভাষা প্রচলন সমিতি। আমরা অনেকেই জুটে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁকেই করা হয়েছিল সভাপতি, আমি কোষাধ্যক্ষ, আর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন মোনায়েম সরকার, পরবর্তীতে যিনি সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। 'মাতৃভাষা' নাম দিয়ে সুন্দর একটি পুস্তিকা বের করা হয়েছিল এবং তখনকার পাবলিক লাইব্রেরির নিচ তলার অডিটরিয়ামে নানা বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম আমরা, যেটি চলেছে একটানা পাঁচদিন ধরে। সমিতির উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চস্তরের শিক্ষার প্রবর্তন বিষয়ে একটি আলোচনা সভার কথাও আমার মনে পড়ে, যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের তখনকার প্রশস্ত কক্ষটিতে।

কিন্তু যেমনটা প্রায়ই হয় এবং ঘটবে বলে আশঙ্কা থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, সমিতির কাজ আর বেশিদূর এগুলো না। পঁয়ষট্টিতে বাঁধলো ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ; যুদ্ধ শেষ হবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, শেষ হবার পর বিমান চলাচল শুরু হতেই আমি লেস্টারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছি, এবার কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে। আর সেখানে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আব্বার চিঠিতে খবর পেলাম মাহফুজুল হক নেই, তিনি নিহত হয়েছেন বিমান দুর্ঘটনায়। বিমান নয় ঠিক, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা। পরীক্ষামূলকভাবে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করা হয়েছিল, তারই একটিতে করে মাহফুজুল হক রাজশাহী যাচ্ছিলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত এক কাজে। ফরিদপুরের কাছে হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে, এবং অন্যসব আরোহীদের সঙ্গে তিনিও প্রাণ হারান।

কেমন যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা বলবার নয়। এর কিছুদিন পরেই খবর এলো আমার আব্বাও আর নেই, তিনি চলে গেছেন পাকস্থলীর সেই রোগে যা অনেকদিন ধরে তাঁকে জ্বালাতন করছিল। তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে লিখেছি, এখানে আর না-ই বললাম। লেস্টারে নাজমা আমার সঙ্গে যেতে পারেনি, সে গিয়ে পৌঁছেছিল মাসখানেক পরে। শোক সংবাদ দুটি পাবার সময় সে উপস্থিত ছিল, নইলে একাকী সহ্য করা আরও কঠিন হতো আমার পক্ষে। মাহফুজুল হকের মৃত্যুর পরে যা ঘটল তা হলো মেধা ও অঙ্গীকারের ক্ষতি। এই দুটি গুণ সে সময়ে বেশ দুর্লভ ছিল, এখন তো দেখি দুটিকে একত্রে পাওয়া খুবই কষ্টকর। প্রতীকী ব্যঞ্জনা হিসাবে এটাও বোধকরি বিবেচ্য যে, হঠাৎ-তৈরি সুযোগগুলো আবার আগ্রাসীও হয়ে থাকে। হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু না হলে মাহফুজুল হক হয়তো রাজশাহীতে অন্যভাবে যেতেন, যেভাবে তিনি আগেও গেছেন, কিন্তু ওই যে নতুন সুযোগ, দ্রুত গমনের ব্যবস্থা, সেই সার্ভিসই কারণ হলো তার এই অকাল-প্রয়াণের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারার আমার যে সুযোগ সেটা কিন্তু আমার জন্য একটি পীড়ার কারণ হয়েছিল। সত্যি বলতে কী ওই ঘটনাটি যখন চূড়ান্তে পৌঁছাল, অর্থাৎ জগন্নাথ কলেজ ত্যাগ করে আমি এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম সেই ক্ষণটির কথা মনে পড়লে এখনও অস্বস্তি পাই। এক ধাক্কায় আমার বয়স তখন মনে হয় কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছিল। চাকরি খালি হবে এমন সম্ভাবনার কথা আগেই শোনা গেছে, প্রফেসর টার্নার তাঁর নবনিযুক্ত অফিস সহকারী বজলুর রহমানের মাধ্যমে কলেজে ফোন করিয়ে আমাকে বলে রেখেছিলেন তৈরি থাকতে। প্রফেসর টার্নার হঠাৎ করে চলে গেলেন ছুটিতে, তাঁর জায়গায় এলেন ড. সাজ্জাদ হোসায়েন, এবং ক'দিন পরেই একই সূত্র মারফৎ খবর পেলাম অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

তিনি জানালেন পরের দিনই আমাকে যোগ দিতে হবে। আমার তো রা সরে না। বললাম, 'স্যার এক মাসের নোটিশ তো দরকার হবে'। স্যার জানালেন যোগ দিতে বিলম্ব হলে আমার নিয়োগপত্রটি কর্তৃপক্ষ ছিঁড়ে ফেলে দেবে, বলে তিনি দু'হাত দিয়ে দেখালেনও ছেঁড়ার দৃশ্যটা কেমন দাঁড়াবে। তাঁর দিক থেকে বক্তব্য ঠিকই ছিল। বিভাগে নতুন শিক্ষক না এলে অচল অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা, এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি ডিন ও ভিসি'র সম্মতি নিয়ে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে এমনকি বিনা দরখাস্তেই আমার জন্য নিয়োগপত্র বের করবার ব্যবস্থা করেছেন, সেক্ষেত্রে যোগদানে বিলম্ব ঘটলে তাঁর কাজটা দাঁড়াবে কিসের ওপর? অতএব আমি যেন সেদিনই গিয়ে প্রিন্সিপালকে জানাই যে পরের দিন থেকে আমি অব্যাহতি চাই। সেটা হবে সাতাশ তারিখ, তাতে কি, এক মাসের বেতন স্যাক্রিফাইস করতে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু আমি তো বেতন হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলাম না, আমার বুক কাঁপছিল এটা ভেবে যে এক্ষুনি আমাকে অব্যাহতি দিন এমন কথাটা অধ্যক্ষকে আমি জানাব কেমন করে।

অধ্যক্ষ হচ্ছেন শেইখ শরফুদ্দিন, রাজশাহীতে আব্বার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিনের তিনি পিতা, এসব একদিকের ব্যাপার; অন্যদিকে সত্য হলো যে তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর কাছে আজেবাজে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া সহজ কর্ম নয়।

সেদিন আর পারিনি, সাহসে কুলায়নি পরের দিন সকাল দশটায় গিয়ে তার দরবারে হাজির হয়েছি, এবং তাঁকে একা পেয়ে ফস করে কথাটা নিবেদন করে ফেলেছি। চলে যেতে পারি এমন কানাঘুষা তাঁর কানে এসে থাকবে, কিন্তু সেটা যে এমন আকস্মিকভাবে ঘটবে তা তিনি নিশ্চয়ই ভাবেননি। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর জানালেন যে এক মাসের নোটিশ লাগবে, আর যদি বিনা নোটিশে আমি চলে যাই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তিনি জানাতে বাধ্য হবেন যে, আমি অব্যাহতি না নিয়েই চলে যাবার অপরাধ করেছি। কথাগুলো বলতে তাঁর সময় লাগেনি, আমিও আর কথা বাড়াইনি, মাথা নত করে চলে এসেছি। তবে যে- আমি তাঁর কামরায় ঢুকেছিলাম সে- আমিটি যে ফেরতও আসেনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ওই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে আবার বয়স বেড়ে গিয়েছিল কয়েক বছর।

ফিরে এসে ড. হোসায়েনকে ঘটনা জানালাম। তিনি নিয়োগপত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কারণ নেই, ওই দিন সকালে নয় বিকেলে আমি যোগ দিচ্ছি জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে যেটা তিনি

রেজিস্ট্রারের দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। তবে অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন কলেজে তাঁর শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন না বলেই ড. হোসায়েন আশা করেন; আর যদি নালিশ আসেই তখন দেখা যাবে কী করণীয়। তা নালিশ এসেছিল বৈকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল (এখান থাকে সিন্ডিকেট হয়) আমার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল, তবে সেটির জবাব যেটি আমি দিয়েছিলাম তা ড. হোসায়েনের মুসাবিদা থেকেই নেওয়া। বলা বাহুল্য, কাউন্সিল আমার সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিল।

দু' বছর পরে লীডস অভিমুখে যে-আমি রওনা হলাম তার মানসিক বয়স যে কতটা সে- বিষয়ে নিশ্চিত হবার অবশ্য কোনো উপায় ছিল না। কেননা এর আগে আমি দেশের বাইরে কখনো যাইনি, প্লেনেও চড়িনি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি-পাওয়া আমরা ছিলাম চারজন, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, রাজিয়া খান (তখন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার), বাংলা বিভাগের এ কে এম আমিনুল ইসলাম এবং আমি। করাচি গিয়ে খাবারের কোন দোকানে ভাত পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে গিয়ে হিমশিম দশা, পাওয়া গেলই না, অথচ লন্ডনে পৌঁছে আমাদের সিলেটী ভাইদের কল্যাণে ভাত তো বটেই, ডাল, ইলিশ মাছ এসবও পাওয়া গেলো। বুঝেছিলাম কে তাঁর মিত্র। তবে করাচিতে চমৎকার বাঙালি রান্না পাওয়া গিয়েছিল করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মুজিবুর রহমান খানের বাসায়; তাঁকে বলা হতো পাঠক, কারণ তিনি রেডিওতে বাংলা খবর পড়তেন, একেবারে নিজস্ব কায়দায়, ওজস্বী ভঙ্গিতে। মুজিবুর রহমান পাঠক এতগুলো মেহমানকে অতিসহজে বাগে এনে ফেললেন, যেমনভাবে সংবাদ পঠনকে আনতেন। আমাদের মধ্যে কে একজন করাচিতে কাঁচামরিচ পাওয়া যায় কিনা জানতে চাওয়াতে ব্যস্ত-হয়ে- ওঠা তাঁর স্ত্রীকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'দেখো ঘরে আছে কিনা; না থাকলে কাতর হয়ে না'। কাঁচা মরিচ পাওয়া গেছিল কি না মনে নেই, তবে কাতর হয়ো না বলে স্ত্রীকে তাঁর ভরসা দেওয়াটা মনে পড়ে।

লীডসের পথে লন্ডনে আমাদেরকে রাখা হয়েছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের একটি ছাত্রাবাসে। ছাত্রাবাসটি তখন খালি ছিল, বার্ষিক ছুটির কারণে। ওখানে আমাদেরকে রাখার উদ্দেশ্য একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বিলেতি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। ব্রিটিশ কাউন্সিল বৃত্তি দিয়ে নানাদেশ থেকে ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের নিয়ে এসেছিল। অনেক ক'জন ভারতীয়ও ছিলেন। যেমন টমাস এসেছিলেন কেরালা থেকে; কেরালায় তখন কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করেছে, কিন্তু খ্রিস্টান টমাসকে মনে হলো না তাতে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে ভাষাই তো টানে সবার আগে, আমরা চার বাঙালি তো ছিলামই, পাওয়া গেল দেবব্রতকে, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ায়, পিতৃকূল ও শ্বশুরকূল উভয়েই এক সময়ে ছিলেন পূর্ববঙ্গবাসী, কিন্তু দেশভাগের আগে থেকেই তারা সবাই কলকাতায় থাকেন।

দেবব্রতের সঙ্গে আমার বন্ধু তো হয়ে গেছে দেখামাত্রই, তার ছিল স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা, যেটা প্রকাশ পেত সংযত ও উপভোগ্য বাগবৈদগ্ধে। লন্ডনে যে চার পাঁচদিন ছিলাম সেটা বিশেষ রকমের উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তার কারণেই। সে গেছে এক্সেটারে, আমি লীডস-এ; কিন্তু যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল চিঠির মাধ্যমে। দশ মাসের কোর্স শেষে আমরা দেশেও ফিরেছি সমুদ্রগামী একই জাহাজে করে। তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দু'বার কলকাতা গেলে প্রত্যেকবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে হাস্যোজ্জ্বল অনেকক'টি ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি । চিঠিপত্রেও যোগাযোগ ছিল। আমাদের ছাত্রদের কেউ কেউ পড়তে গেছে যাদবপুরে তাদের মাধ্যমেও আদান প্রদান হয়েছে খবরাখবরের; দেবব্রতের এক ছাত্রের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের আমি পরীক্ষক হয়েছিলাম, আমার এক ছাত্রীর অভিসন্দর্ভও সে পরীক্ষা করে দেখেছে। ক'দিন আগে শুনলাম দেবব্রত আর নেই; শেষ দিকে শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এক সময়ে চলেই গেল। যেমন হয়, আমার জন্য আরেকটা শূন্যতা তৈরি হলো। নাজমা চলে গেছে আঠার বছর আগে, নইলে দেবব্রতের কথা সে এতো শুনেছে যে সে নেই শুনলে অত্যন্ত দুঃখিত হতো।

লীডস শহরটা ছিল উত্তরাঞ্চলের লন্ডনের মতো, বড় তো বটেই; উদারনৈতিক, এবং বহু সংস্কৃতির উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অনেক ক'জন বাঙালি ছাত্রছাত্রীর খোঁজ পাওয়া গেল, কেবল যে বাঙালিদের ব্যাপারে তা নয়, উপমহাদেশের অন্যদের ব্যাপারেও টের পেলাম হিন্দুস্তান পাকিস্তান বিভাজনটা কতটা কৃত্রিম।

বাঙালিদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূরুল ইসলাম। অত্যন্ত অমায়িক, সজ্জন ও সংবেদনশীল একজন মানুষ। তিনিও আমাদের এই কোর্সেই ভর্তি হয়েছেন, তবে বৃত্তি নিয়ে আসেননি। এসেছেন নিজের খরচে। লীডস-এ নয়, পিএইচডি'র জন্য নূরুল ইসলাম গিয়েছিলেন নটিংহাম-এ, যেখান থেকে আমাদের এবং তাঁরও দুজন শিক্ষক ওই ডিগ্রি লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি যে একটি নয়, দুই দুটি ভুল করেছেন সেটি বুঝে ফেলেছেন নটিংহাম-এ পৌঁছেই। প্রথমত আসবার আগে ভর্তির ব্যাপারটা ঠিক করে আসেননি; আর দ্বিতীয়ত যে- বিষয়ে গবেষণা করবেন বলে আশা করেছিলেন সেটিও পিএইচডি'র জন্য উপযুক্ত রকমের সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল না। লেডি উইনচেলশিয়া নামে একজন কবির সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি, যিনি ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমসাময়িক, পুরোপুরি না হলেও অনেকটা রোমান্টিক, কিন্তু তেমন প্রতিষ্ঠা পাননি। নূরুল ইসলাম আশা করেছিলেন যে এই কবির ওপর কাজের সুযোগ রয়েছে; কিন্তু নটিংহোমে গিয়ে ভর্তির জন্য যে অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি জানলেন যে উইনচেলশিয়ার ওপর নতুন তথ্য পাওয়া কঠিন হবে, এবং পরামর্শ দিলেন নতুন বিষয় খুঁজে বের করতে। নূরুল ইসলাম নতুন বিষয় চট করে খুঁজে পান না, এবং পেলেও সেটিকে অধ্যাপক মাথা নেড়ে এবং বিরক্তির সঙ্গে নাকচ করে দেন কি না, এই মিশ্র বিপদে পড়ে বেচারার মন গেছে ভেঙে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন, কথা ছিল দু'জনে মিলে উপার্জন করে সংসার চালাবেন, এবং নূরুল ইসলাম সেই সঙ্গে গবেষণাও করবেন। উপার্জনের জন্য দুজনকেই কাজ খুঁজে নিতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গবেষণা মোটেই এগুচ্ছে না, ওদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে দেখে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। লীডস থেকে তাঁর স্ত্রীর বোন ও ভগ্নিপতি দু'জনেই পিএইচডি করেছেন, পদার্থ বিজ্ঞানে; যার দরুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছুটা তিনি জানতেন, এখানে নতুন একটি স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হচ্ছে খবর পেয়ে এতে ভর্তি হয়েছেন; তাঁর ইচ্ছা এরই মধ্যে থেকে গবেষণার নতুন বিষয় ঠিক করে নিয়ে পিএইচডি'র জন্য ভর্তি হবার উদ্যোগ নেবেন।

লীডস-এ তিনি একাই এসেছিলেন, স্ত্রী রয়ে গেছেন নটিংহামেই; সপ্তাহান্তে নূরুল ইসলাম সেখানে চলে যেতেন। আমরা বৃত্তিধারীরা থাকতাম ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঠিক করে দেওয়া ল্যান্ডলেডিদের বাসায়, যেখানে সকালের ও রাতের খাবার পাওয়া যেতো, দুপুরে খেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফেকটরিতে। নূরুল ইসলাম থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই একটা কামরা নিয়ে, সেখানে অন্য ছাত্ররাও থাকতো, এবং রান্না করার জন্য ছোট একটা জায়গা ছিল। নূরুল ইসলাম অন্যব্যাপারে যেমন খাদ্যের ব্যাপারেও তেমনি রুচিবান ছিলেন, কখনো কখনো প্রায় টেনে নিয়ে যেতেন তাঁর ঘরে, রান্না করা ভাত-মাংসের উপাদেয়তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

আমাদের এই কোর্সটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকের ভেতরে একটা অসন্তোষ ছিল। সেটি এই যে, কোর্সের সিলেবাসটা বেশ ভারি, যার ভেতর এমনকি ভাষাতত্ত্বেরও একটা বাধ্যতামূলক অংশ ছিল, অমন একটা কোর্স সমাপ্ত করলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এমএ ডিগ্রি পাওয়া যায়। আমেরিকায় তো বটেই, গ্রেট ব্রিটেনেও। কিন্তু লীডস-এ এটি শেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাপ্য ছিল একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অবশ্য পরে দেখেছি লীডস-এর এই ডিপ্লোমা বেশ কদর পেয়েছে। পাঁচ বছর পরে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে যখন লেস্টারে যাই তখন বৃত্তিপত্রে লেখা ছিল আমাকে এমএ কোর্সে ভর্তি করা হচ্ছে তবে বৃত্তি পিএইচডি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। সেখানে গিয়ে লীডস-এ আমার পড়াশোনা এবং কোর্সের অংশ হিসেবে জেন অস্টেনের নায়কদের ওপরে ছোট একটি অভিসন্দর্ভ রচনার অভিজ্ঞতার কথা জেনে সুপারভাইজার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে আমাকে সরাসরি পিএইচডি কোর্সেই নিয়ে নেওয়া হোক। তাঁর সেই সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল। লীডস-এর দশ মাস দেখতে দেখতে কেটে গেছে; পরীক্ষা শেষে ফল যখন প্রকাশিত হলো দেখা গেল যে দশ-বারো জন ছিলাম তারা সবাই পাস করেছে, কেবল একজন ভারতীয় ছাড়া। সে বেচারা শিখ, নাম থাপর, ভর্তি হয়েছিল নিজ খরচায়। থাপরের স্ত্রীও এসেছিলেন বিলেতে।

তিনি লন্ডনে থাকতেন এবং কাজ করছিলেন পিএইচডি'র জন্য। থাপর তাঁর স্ত্রীর মুখোমুখি হবে কীভাবে সেটা ভেবে বেচারার জন্য আমার ভারি মায়া লেগেছিল।

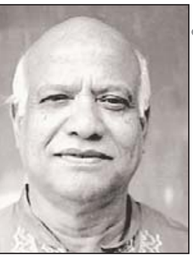

আবুল মাল আবদুল মুহিত

> মুন্সিগঞ্জ আমার কিছুটা চেনা, তাছাড়া সেখানে আত্মীয় হিসাবে দাবি করা যায় এমন পরিবারও ছিল দুয়েকটি। মুন্সিগঞ্জ ঢাকা থেকে কাছেও। আর আছে নদী, যা আমাকে সব সময়েই টানে। হরগঙ্গা কলেজে আমার ঠিক আগে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত, তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়াতে জায়গাটা খালি হয়েছিল

আমি চলে এলাম দেশে, নূরুল ইসলাম ফিরে গেলেন নটিংহামে। কিছুদিন সেখানে থেকে শেষে চলে এসেছিলেন দেশে। ফেরার পর তাঁকে আমি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম, আমাদের 'পরিক্রম' পত্রিকায় বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ওই বিষয়টা নিয়ে তখন দেশ-বিদেশে নানা কথাবার্তা চলছিল। আমরা যখন ইংল্যান্ডে তখন ঔপন্যাসিক সি পি স্নো 'টু কালচারস' নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তখনকার ব্রিটিশ সংস্কৃতি খাড়াখাড়ি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিভাজনটি ছিল বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার; মানববিদ্যার, বিশেষ করে সাহিত্যের চর্চা যারা করে তারা বিজ্ঞান সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে বলে আর্তচিৎকার তুলেছে; আর বিজ্ঞানীরা বলছে অবিজ্ঞানীরা কিছুই জানে না, পারেও না কিছু করতে, কেবল ভয় পাওয়া ছাড়া। এখন সন্দেহ হয় স্নো নিজেও বুঝি ভয় পেয়ে গেছিলেন, পৃথিবীময় শ্রেণী সচেতনতার বাড়বাড়ন্ত দেখে শ্রেণী বিভাজনকে তিনি অস্পষ্ট করে দিতে চাইছিলেন বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার বিরোধকে সামনে নিয়ে এসে। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটাকে তখন এভাবে দেখতে শিখিনি। নূরুল ইসলামের কাছ থেকে আরও লেখা নিশ্চয়ই আমরা পেতাম, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষণ অবশ্য ইংল্যান্ডে থাকতেই দেখা দিয়েছিল, তার কণ্ঠনালি শুকিয়ে যাচ্ছিল; তবে সেটা যে ক্যান্সারে রূপ নেবে তেমনটা কেউ ভাবেনি, কিন্তু অভাবনীয়টাই ঘটলো, ক্যান্সার ধরা পড়লো, এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে তিনি চলে গেলেন।

পরে জেনেছি লীডস-এর ওই স্নাতকোত্তর কোর্সটা চালুই হয়েছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলের অর্থানুকুল্যে। লীডস-এ পৌঁছার কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্থানীয় প্রধান আমাকে একটি পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎকারে ডেকেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, এই কোর্সে ভালো করলে শিক্ষার্থীকে পিএইচ ডি'তে ট্রান্সফার করা হবে কি না; শুনে তিনি প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, মোটেই না, বৃত্তিটা ওই দশ মাসেরই; তাঁদের নীতি হলো যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় স্কলারকে নিয়ে আসা। আমার বৃত্তি যদি বাড়ানো হয় তাহলে তার অর্থ কি দাঁড়াবে না আমার দেশের অপর একজনকে বঞ্চিত করা, পাল্টা তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে। কমনওয়েলথ বৃত্তি তখনো চালু হয়নি, সেটা এসেছে পরে, এবং তার সময়কাল শুরুতেই ঠিক করে দেওয়া হতো দু'বছর আট মাসের। সে বৃত্তিটা অবশ্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের নয়, অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভারসিটিজ-এর। দুই প্রতিষ্ঠানের ভেতর একটা পার্থক্য ছিল, বোঝা গেছে।

লীডস-এ এসে আমার চিত্তের অনুভবযোগ্য প্রসার ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তখন বামপন্থীদের আধিপত্য। ইংরেজি বিভাগেই ছিলেন আর্নল্ড কেটল, যিনি মার্ক্সবাদী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। আমরা গিয়ে শুনি আমাদের আগে একজন নাইজেরীয় ছাত্র ইংরেজীতে অনার্স পাস করে গেছেন। যিনি কেটলের বিশেষ স্নেহ ভাজন ছিলেন। পরে জেনেছি ওই ছাত্রটি হচ্ছেন নাট্যকার ওলে সোয়েঙ্কা, আরও পরে সাহিত্যের জন্য যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং নাইজেরীয় স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রত্যাশিরূপে নাইজেরিয়া থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন। আমাদের কোর্সের ছাত্রদের জন্য একটি অভিসন্দর্ভ রচনা বাধ্যতামূলক ছিল। এবং সে কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে একজন শিক্ষককে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। আমি পেয়েছিলাম কেটলকে। সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বললাম আমার ইচ্ছা জেন অস্টেনের নায়কদের 'নায়কত্ব' সম্বন্ধে লেখার। অস্টেনের প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই একটি নিজস্ব জগৎ রয়েছে, সেই জগতের মূল্যবোধ ও আদর্শের মাপে নায়করা কেমন নায়কোচিত– এটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, এই রকম ছিল বক্তব্য। বিষয়টিকে তিনি যে অপছন্দ করেছেন এমন মনে হয়নি, যদিও বিভাগের একজন তরুণ শিক্ষক পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে ওই রকমের বিষয়ে কেটলের উৎসাহ থাকবার কথা নয়। কেন নয়, সেটা ততদিনে আমার জানা হয়ে গেছে, কিন্তু জেন অস্টেনের নায়কদের আচরণের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা দেবার মতো জ্ঞান আমার তো তখন ছিলই না, দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল না, যদিও টাকা ও সম্পত্তির প্রতি মনোভাবের দিক থেকে মার্ক্সের আগেই জেন অস্টেন মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন বলে একজন সমালোচকের মন্তব্য আমার ওই লেখাটির মধ্যে উদ্ধৃত করেছিলাম। টাইপ করার আগে রচনাটি কেটলের ডাকবাক্সে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখি এখানে সেখানে প্রশ্নবোধকচিহ্ন আছে বটে, তবে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। সেটা বেশ স্বস্তির কারণ হয়েছিল।

বিভাগে সবচাইতে বর্ণবহুল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন উইলসন নাইট, পোশাকের ব্যাপারে তাঁর অমনোযোগের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শোনার যে-আনন্দ সেটা তো বর্ণনা করা যাবে না। বয়সে তখন তিনি প্রবীণ, কিন্তু উৎসাহে ভরপুর। ঘর-সংসার ছিল না, সারাটা সময় পড়া, পড়ানো ও লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রথমই যে জ্ঞান লাভ করেছিলাম সেটা এই যে, ক্লাসে পাঠদানের সময় স্বতঃস্ফূর্ততার তেমন কোনো দাম নেই; যে- স্বতঃস্ফূর্ততাকে আমরা খুবই দাম দিতাম, এখনো দেই। শিক্ষক যদি অনর্গল বক্তৃতা করতে না পারেন, যদি থেমে থেমে, কাগজপত্র দেখে, বলেন তাহলে মনে করার রীতি আছে যে, তিনি তেমন একটা জ্ঞানী নন, তাঁর জ্ঞানের বহরটা সঙ্কীর্ণ। অথচ লীডস গিয়ে দেখি সকল শিক্ষকই লিখিত নোটস ও বইপত্র সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন, দরকার মতো দেখে নেন। কোন বিষয়ে কোন দিন বলবেন তার তালিকা শিক্ষক নোটিশ বোর্ডে আগেই টানিয়ে দেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুত হয়ে যোগ দেয়। উইলসন নাইটকে দেখেছি খাতাপত্র নিয়ে ক্লাসে আসতেন, সে-বছর তিনি যে-বক্তৃতাগুলো দেন পরের বছর দেখলাম সেগুলো একত্র হয়ে 'ব্রিটিশ ড্রামা' শিরোনামে বই হয়ে বের হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা বলি। কোনো কোনো কোর্সের শুরুতে যে পরিচিতিপত্র বিলি করা হয়েছে তাতে উল্লেখ দেখলাম পরীক্ষার হলে টেক্সট বই নেওয়া যাবে, তবে তাতে কোনো নোটস বা ভূমিকা লেখা থাকবে না। প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড, পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক, স্মৃতি থেকে উদ্ধার না করে বই থেকে দেখে দেখে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, এমনটা ভাবা যায়? অথচ পরে বুঝেছি যে, এটাই তো স্বাভাবিক। পরীক্ষাটা তো স্মৃতিশক্তির হচ্ছে না, হচ্ছে বুঝবার ও বোঝাবার দক্ষতার, সেক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত না রেখে পরিষ্কার রাখাটাই শ্রেয়, যেমনটা শার্লক হোমস জানিয়েছিলেন তাঁর সহকারী ড. ওয়াটসনকে, বলেছিলেন, 'ওয়াটসন মাথাটাকে সব সময়ে পরিষ্কার রাখবে, নইলে অপরাধীদের ধরতে পারবে না।' লীডস-এ পরীক্ষার একটি বিষয় হিসেবে আমি যে জন মিল্টনকে বেছে নিতে সাহস করেছিলাম সেটি তো ওই ভরসাতেই যে পরীক্ষার হলে মিল্টনের কবিতার বই ডেস্কের ওপরেই রাখতে পারব, নকল করছি বলে বদনাম হবে না।

বিভাগের প্রধান ছিলেন নরমান জেফার্স, তিনিও খ্যাতিমান গবেষক, যদিও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন, আগেই বলেছি, উইলসন নাইট। উইলসন নাইট দাপ্তরিক কাজ করছেন এটা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল মঞ্চাভিনয়ে যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তখন শিক্ষকরা যখন 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র মঞ্চায়ন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। উইলসন নাইট নেমেছিলেন শায়লকের ভূমিকায়। সংলাপ বলায়, ভাবে ভঙ্গিতে, চুপ করে থাকায় শায়লক যে কেবল মূর্ত

হয়ে উঠেছিল তা নয়, তার চরিত্রের একটা নতুন ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছিল। নরমান জেফার্সের সম্পাদনায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটলো ওই সময়ে, নাম 'রিভিও অব ইংলিশ লিটারেচার', সম্পাদনা করতেন তিনি, লীডস থেকে ছাপা হতো লন্ডনে। সম্পাদকরা তো বরাবরই আমার কাছে কৌতূহলের পাত্র, নরমান জেফার্সের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন দেখে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম, আমার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজলে মনে হয় পাওয়া যাবে। লেকচারারদের একজন ছিলেন ডি ডবু জেফার্সনের, যাঁর সঙ্গে আমার প্রয়াত সহকর্মী অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা ষাট দশকের শেষের দিকে কাজ করেছেন। দোহার অভিসন্দর্ভ সুইফটের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে, ওটি আমার নামে উৎসর্গ করে আমাকে তিনি একটি অতিরিক্ত বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন। শামসুদ্দোহার থিসিসটি একটু বাড়িয়ে লিখলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো তাকে পিএইচডিই দিত, কিন্তু লীডস থেকে তিনি এমএ ডিগ্রি নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে ফিরেছিলেন, ডিগ্রি দেবার ব্যাপারে সেকালে লীডসের ইংরেজি বিভাগকে বেশ খুঁতখুঁতে বলেই আমার মনে হয়েছে।

লীডসের কাছেই ব্রাডফোর্ড, শিল্পশহর, যেখানে গিয়ে প্রচুর বাঙালি ও অকৃত্রিম বাঙালি পরিবেশের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার জন্য খুবই স্মরণীয় হয়ে আছে এমিলি ব্রন্টি ও শার্লট ব্রন্টিদের বাড়ি দেখে আসার অভিজ্ঞতা। লীডস থেকে কাছেই, আমরা কয়েকজন মিলে গেছি দেখতে। সেখানে ছোটখাটো একটি শহর গড়ে উঠেছে, কিন্তু ব্রন্টিভগ্নিদের বাসগৃহ, পরিবেশ, প্রান্তর, পর্বত এবং যে বাড়িটির নামে এমিলি ব্রন্টি তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'উদারিং হাইটসে'র নামকরণ করেছিলেন সেগুলো সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। ওখানে গিয়ে যে সুভেনিরটি কিনেছিলাম সেটি আমার এই লেখাটি তৈরি করার সময় খুঁজে পেলাম, তারিখ লেখা আছে ২১ নভেম্বর ১৯৫৯। মনে পড়লো কি কি দেখেছিলাম, এবং মনে মনে কীভাবে অভিযুক্ত করেছিলাম আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের প্রজন্মের সেই সিলেবাস প্রস্তুতকারকদের, যাঁরা এমিলি ব্রন্টির ওই অসামান্য রচনাটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়বার সুযোগ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছিলেন। কোন যুক্তিতে জানি না। হীলক্লিফকে নায়ক হিসেবে দেখতে পেলে ছেলেমেয়েরা বখে যাবে এই আশঙ্কায় কি? শেকসপীয়রের স্ট্যাফোর্ড দেখা তো ইংরেজি সাহিত্যের যেকোনো ছাত্রর জন্যই একটি কাঙ্ক্ষিত কাজ, সেটিও আমরা সুসম্পন্ন করতে পারছিলাম।

২০.

কোর্সের পরীক্ষা শেষ হলে আমি পুনরায় লন্ডনে এসেছি। ততদিনে এটিএম মাহবুবউল হকও সেখানে এসে গেছে। মাহবুব ইতিহাসের ছাত্র, আমাদের পরের বছরের, বাড়ির অবস্থা ভালো, বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ব্যারিস্টার হোক, মাহবুব ঠিক করেছে সে অধ্যাপক হবে, ভর্তি হয়েছে ওরিয়েন্টাল স্কুলে, বিষয় ঠিক করেছে ব্রিটিশ লেবার পার্টির সূচনার ইতিহাস। তার ঝোঁকটা তখন পরিষ্কাররূপে বামপন্থী। আমাকে নিয়ে তুলল সে তার বাসায়, নদী পার-হওয়া ব্রিক্সটনে। তার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরলাম। তখন ব্রেখটকে নিয়ে ঔৎসুক্য শুরু হয়েছে। টেমস নদীর ধারে ছোট একটি প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছিল বেখটের 'গ্যালিলিও' নাটকটি। সেটি দেখলাম এবং ধারণা করতে পারা গেল কেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামীতে আরো অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। ঠিক বিপরীত ধারার না হলেও ভিন্ন ধারার নাটক লিখছেন ফ্রান্সের ইউজিন ইউনেস্কো। কেবল যে উপস্থাপনায় ভিন্ন তা নয়, দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। বেখটের গ্যালিলিও আপাতত আত্মসমর্পণ করেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর আঙ্গীকার নত হয়নি, তিনি তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ গোপনে প্রায় অন্ধকারে বসে দিনের পর দিন লিখেছেন এবং একজন অনুরাগীর মাধ্যমে পাচার করে দিয়েছেন অন্যদেশে। ইউনেস্কোর 'রাইনোসেরাস' নাটকটি দেখলাম আমরা ইংরেজি অনুবাদে, যেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষেরা সবাই একে একে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না শুধু ছোটখাটো একটি লোক, যে ঠিক করেছে কিছুতেই গণ্ডার হবে না। নাটকটির একটি কপি আমি কিনে এনেছিলাম; মুনীর চৌধুরীর আগ্রহ দেখে তাঁকে দিয়েছিলাম পড়তে এবং পরে যখন তিনি বললেন এটা তাঁর কাছে থাকুক, তখন খুশি হয়েছিলাম তাঁকে একটা কিছু দিতে পারলাম ভেবে। হ্যারল্ড পিন্টার ও তাঁর সঙ্গী রাগী ছোকরাদের তখন উত্থানপর্ব, তবে তাঁর কোনো নাটক দেখা হয়নি। দেখেছি বার্ণাড শ'র 'ডিয়ার লায়ার', যেটি আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা নাটক নয়, শ' এক মহিলার কাছে যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেগুলোর সঙ্গে তাঁর পত্রের যেসব জবাব এসেছিল সেগুলোকে সংলাপের আকারে সাজিয়ে নাটকটিকে তৈরি করা হয়েছে। উপস্থাপনাটাও অভিনব, চরিত্র দুটিই, তাও তারা অভিনয় করছেন না, পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে বসে সংলাপ বলে যাচ্ছেন।

সবই সম্ভব হয়েছিল মাহবুবউল হকের সহযোগিতায়। লন্ডনকে তখন আমার মনে হচ্ছিল একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যে যা চায় আহরণ করতে পারে। ইচ্ছা মতো। আমার সহপাঠীদের একজনের কথা বলা হয়নি, তার নাম আনওয়ার হোসেন, আনওয়ারের কর্মজীবনে বেশির ভাগ কেটেছে একটি ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে। তার সঙ্গে আমার একটি পত্রিকা-পাঠের স্মৃতি জড়িত। আনওয়ারের একজন আত্মীয় থাকতেন লন্ডনে, হয়তো তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হবেন, তিনি মাসিক 'এনকাউন্টার' পত্রিকার অনেকগুলো কপি পাঠিয়েছিলেন আনওয়ারের জন্য, সেই আমরা যখন ছাত্র সে-সময়ে। আনওয়ার আমার আগ্রহের কথা জানত, সে সবগুলো দিয়ে দিয়েছিল আমাকে, পড়তে। পরে ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতেও 'এনকাউন্টার' আসতো, আমি সুযোগ পেলেই পড়তাম। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি স্টিফেন স্পেন্ডার, যাঁর লেখা কবিতা ও বই আমার পড়া ছিল। লন্ডনে এসে সেই পত্রিকার অফিসটা যদি চোখে পড়ে তাহলে একনজর দেখে নেব এই ইচ্ছাটা ছিল। ঠিকানাটা জানতাম, লন্ডনের কেন্দ্রীয় এলাকাতেই, সেখানটা দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু বড় দালানটির বাইরে থেকে জানবার উপায় ছিল না যে ওইখানে সেই বিখ্যাত পত্রিকার কার্যালয় অবস্থিত। পরে জেনেছি কেবল কার্যালয়ই নয়, পত্রিকার প্রকাশনার পেছনে যারা ছিল তারাও বেশ রহস্যময়। কেননা পত্রিকাটি ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র অর্থে পরিচালিত। স্পেন্ডার সম্পাদক, তাই নামকরা লেখকরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখতেন, কিন্তু তাঁদের ওইসব রচনার আবডালে সোভিয়েট-বিরোধী একটি-দুটি রচনা পাচার করে দেওয়া হতো, এবং ওই পাচার করাটাই ছিল পত্রিকা প্রকাশের পেছনে আসল অনুপ্রেরণা। স্পেন্ডার ওইভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন সেটা তিনি জানতেন কি না জানি না, কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর পত্রিকার পাঠকমহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, অনেকেই পড়া ছেড়ে দিয়ে থাকবেন। আমি যে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেটা তো জানিই।

মাহবুবউল হকের কথা বলছিলাম। ওই যে অমন প্রাণবন্ত বন্ধুবৎসল বাম চিন্তাধারায় আগ্রহী মানুষটি তার শেষ পরিণতিটা বড় করুণ। না, সে বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়েনি মোটেই। সেই ব্যাপারে সে অনড় ছিল। কিন্তু কেন জানি না তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষণার কাজটি সে শেষ করতে পারেনি। অন্যরাও ঠিক জানে না, তার কারণ এক সময়ে সে প্রায় সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশে ফিরে এসে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছে। থাকতো নিজেদের বাড়ির বাইরের ঘরে। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছিল এবং তার সকল মনোযোগের কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছিল ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা, যাদের লেখাপড়ার ব্যাপারটাকে সে তার প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতো।

পরিবর্তন এসেছিল একাত্তরে। তখন সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। নোয়াখালির গ্রামের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে অত্যন্ত হতাশ হয়েছে চতুর্দিকে পরাজয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে। ভাবছিল কি করা যায়। তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ততদিনে স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করেছে, তাই গ্রামে তার জন্য কোনো কাজ নেই। চলে এসেছিল ঢাকায়। থাকতো বোনের বাড়িতে। সম্ভবত এই বোনের সঙ্গে চায়ের কাপ নিয়ে ঝগড়া করেই কৈশোরে মাহবুব চা খাওয়া ছেড়েছিল। স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাহবুব আসতো, এলে অবশ্যই দেখা করে যেতো আমাদের সঙ্গে। নাজমা মাহবুবের গল্প শুনেছে আগেই, দেখা হওয়ার পরে বলেছে, 'আপনি তো দেখছি যা শুনেছি তার চাইতেও ভালো মানুষ।' তখন আমার একটি নতুন বই বের হয়েছে, 'নিরাশ্রয় গৃহী' নামে। মাহবুব উদ্যোগী হয়ে তার ওপর আলোচনা বৈঠক বসালো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে। তাতে অন্যদের ভেতর সন্তোষ গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সন্তোষদা'র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

নাজমার সঙ্গে সে পরামর্শ করছিল একটা ট্রাস্ট খোলা যায় কি না এ বিষয়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনি মাহবুব অসুস্থ। সে নিজেই জানালো।

স্ত্রী নাজমা জেসমীন

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে নাজমার সহকর্মীরা হাস্যপরিহাস করে বলেছেন, 'আমাদের এখানে তো মিষ্টি স্পর্শ করতেও আপনার অনীহা, কিন্তু বাসায় তো দেখলাম দিব্যি উপভোগ করছেন।' নাজমা নাকি মিষ্টি করে হেসে বলেছে, 'বিপাকে পড়লে অনেক কিছুই করতে হয়

এসেছে কেডস্ জুতা পরে, বললো হাঁটতে অসুবিধা, এক পায়ে ব্যথা দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন পরে নিজেই এসে জানালো যে পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, পায়ের ঘা'টাতে ক্যান্সারের লক্ষণ। আমরা অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে পড়লাম, কিন্তু মাহবুবের দেখি অসামান্য মনের জোর, বললো, ভয়ের কোনো কারণই নেই, চিকিৎসা সম্ভবপর। এর কিছুদিন পরে দেখি চিঠি লিখেছে, তাতে জানাচ্ছে যে সে এখন আমাদের নিকট-প্রতিবেশী, আছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, রাস্তার অপর পারে। আমি গেছি দেখতে। দেখি মোটেই কাবু হয়নি। তার সঙ্গে শেষ দেখা পঙ্গু হাসপাতালে, কয়েক মাস পরে। সেখানে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ভিড়। দেখছি মাহবুব আতিথেয়তায় ব্যস্ত। একজনকে বলছে ফ্লাস্ক থেকে গরম পানি নিয়ে আমাকে হরলিকস বানিয়ে দিতে। আপত্তি করায় জানালো তাহলে অন্তত একটি কমলালেবু নিয়ে যেতে হবে হাতে করে, খালি হাতে ফেরা চলবে না।

নাজমা খুব বিষণ্ন ছিল এসব খবর শুনে। মৃত্যুর খবরটা যেদিন পেলো সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণের জন্য। এর বছর পাঁচেক পরে নাজমা নিজেই তো চলে গেল, ওই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে। ক্যান্সারের চিকিৎসা-ব্যবস্থা তখন ছিল খুবই অকিঞ্চিতকর পর্যায়ে। মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপির যে যন্ত্রটি ছিল সেটি অনেক সময় কাজ করতো না, কেমোথেরাপি ছিল অলভ্য; সিটি স্ক্যানিং ব্যবস্থা চালুই হয়নি। ক'দিন আগে একটি লেখা পড়ছিলাম। লেখক দুঃখ করে বলছেন যে পাকিস্তানীদের আমরা গালমন্দ করি সেটা ঠিকই আছে, তারা আমাদের ওপর অত্যন্ত নিম্নস্তরের নির্যাতন চালিয়েছে; কিন্তু এটাও তো আজ দেখা যাচ্ছে যে, ওদের অত্যন্ত ওই দূষিত ভূমিতে মেধার যেটুকু লালনপালন আছে সেটুকুও আমাদের এখানে নেই। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। মেধার যত্ন নানাভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে– সামাজিক প্রতিকূলতা রয়েছে, চিকিৎসা-ব্যবস্থা যে অনুকূলে কাজ করছে তাও নয়। চিকিৎসার আয়োজন এখন আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে, কিন্তু তবু সেটা যে নির্ভরযোগ্য হয়েছে এমন তো বলা যাবে না।

সেবার লন্ডনে আবিদ হুসেনের সঙ্গেও দেখা। হতেই হবে। সে নিয়ে গেল বিবিসিতে। সেখানে তখন নাজির আহমদ এবং সিরাজুর রহমান আছেন, তাঁদের ও অন্যদের সঙ্গে কথা হলো, তাঁরা বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন, থাকলে আমাদের এখানে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারতেন, আমরা খুশি হতাম। এত তাড়াহুড়ো কেন ফেরত যাচ্ছি এই প্রসঙ্গটা অন্যরাও তুলেছিলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন থেকে গিয়ে চাকরি-টাকরি করে একেবারে পিএইচডিটা সঙ্গে করে তবে ফিরতে, কবে আবার আসা হয় কী না হয়! কিন্তু আমার নিশ্চুপ থাকা দেখে টের পেয়েছে যে আমার ভেতর সেই দুঃসাহসিক নায়কটি নেই, যে অভিযানে বের হবে; আমি নিতান্তই গৃহপালিত এবং গৃহে পালিত হতে আগ্রহী একটি প্রাণী।

রাজ্জাক স্যার কিন্তু ওই রকমের কোনো সুপরামর্শ দেননি। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক গিয়েছিলেন হার্ভার্ডে, হেনরি কিসিঞ্জার যে বার্ষিক সেমিনারের আয়োজন করতেন তার একটিতে যোগ দিতে, ফেরার পথে লন্ডনে থেমেছেন। এ কে এম আমিনুল ইসলাম তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন তাঁর বাসায়। আমাকেও বলেছিলেন যেতে, তরিকুল আলমও ছিলেন, তিনি তখন লন্ডনে। দেশে ফিরছি শুনে রাজ্জাক স্যার জানতে চাইলেন বাহনটি কে হবে। জাহাজে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে শুনে সবাই হৈচৈ করলেন, বললেন বেশ মজা পাব। শুধু রাজ্জাক স্যারই বললেন ভিন্ন কথা। প্রস্তাব করলেন স্থলপথে ভ্রমণের। তিনি নিজেও ওইভাবে যাবেন ভাবছেন, সঙ্গী হিসেবে আমাকে পেলে অত্যন্ত প্রীত হবেন, জানালেন তিনি। আমরা প্রথমে যাবো ফ্রান্সে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ইউরোপ হয়ে চলে যাবো মধ্যপ্রাচ্যে, সেখানে বাস পেয়ে যাবো। থাকবো সরাইখানায়, পথে স্বাদ পাবো রুটি ও কাবাবের। খাইবারপাস দিয়ে গিয়ে হাজির হবো করাচীতে। সেখান থেকে উড়োজাহাজ ধরা যাবে। রোমাঞ্চকর প্রস্তাব। বোধকরি আশা করেছিলেন যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবো। কিন্তু হচ্ছি না দেখে দমে গেলেন। বললেন, 'দেখেন চিন্তা কইরা'।

তিনি আমার ওপর যতটা ভরসা করেন ততটা যোগ্যতা আমার অবশ্যই ছিল না। যে জন্য আমি সাড়া দিতে পারিনি। তাঁরও ওই পথে ফেরা হয়নি, সহযাত্রীর অভাবে। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর স্নেহ রয়েই গেছে। কবি হাউসম্যান চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'দি নেইম অ্যান্ড নেচার অব পোয়েট্রি' নামে; যাতে কবিতার রোমান্টিকতা নিয়ে মৌলিক চিন্তার বিন্যাস ছিল। রাজ্জাক স্যার সেটি কেবল পড়েননি, মুদ্রিত বক্তৃতাটি তাঁর সংগ্রহে ছিল; সেটি আমাকে দিয়েছিলেন অনুবাদ করতে। আমি কাজটা করেছিলাম এবং ভূমিকা ও টীকা যুক্ত হয়ে সেটি বাংলা একাডেমী থেকে বই হয়ে বের হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি তিনি দিয়েছিলেন সেটি গবেষণার, এবং তা ছিল একই সঙ্গে অত্যন্ত মৌলিক ও খুবই দুঃসাহসিক। আমি পিএইচ ডি করতে যাচ্ছি শুনে তিনি বলেছিলেন একটি বিষয় তাঁর মাথায় অনেক দিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটি নিয়ে আমি ভাবতে পারি। তারপরে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গি ও ভাষায় যে প্রস্তাবনাটি উপস্থিত করেছিলেন সেটা এই রকমের। লেখক চার্লস ল্যাম্ব চাকরি করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডন অফিসে; তাঁর দায়িত্ব ছিল কোম্পানির বোর্ড ও ডিরেক্টরদের হয়ে চিঠিপত্র লেখা। অর্থাৎ যথার্থ কেরানীর। ওইসব চিঠিপত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। সেগুলোকে চিহ্নিত করে ল্যাম্বের ভাষা ও রচনারীতির ওপর যদি আমি গবেষণা করি তাহলে সেটি এমন একটি কাজ হবে যেটি স্থায়ী মূল্য লাভ করতে বাধ্য। প্রস্তাবটি যে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু আমি তো জন্মভীরু। মৃদু হেসে বলেছিলাম, 'কথা তো ঠিকই স্যার। কিন্তু ওই চিঠিপত্রগুলো চিহ্নিত করতেই হয়তো দশ বছর লেগে যাবে, আমার বৃত্তি তো মাত্র দুই বছর আট মাসের।' শুনে তিনি হো হো করে হেসে বললেন, 'ভয় পাইয়া গেলেন!'

তা ভয় পাবার মতো কাজ তো বটেই। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি অন্য যে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটি অতটা দুঃসাধ্য নাও হতে পারতো। প্রস্তাবটি ছিল এই যে, একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করা চাই। যুক্তভাবে, যেটির সম্পাদক হবেন সরদার ফজলুল করিম ও আমি। পত্রিকার ব্যাপারে আমার আগ্রহের বিষয়টা তিনি লক্ষ করে থাকবেন। পত্রিকা অবশ্য বের করা হয়নি। টাকা দেবে কে?

তবে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য না হোক, লন্ডন শহরে একদিন অনেকক্ষণ আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি। টেইট গ্যালারিতে তখন আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী চলছিল। কথা ছিল গ্যালারির দরজায় দুজনেই ঠিক দশটায় গিয়ে উপস্থিত হবো। দেখা গেল ঠিক তাই ঘটেছে, দশটা বাজা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দেখি দুজনেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত। ঘুরে ঘুরে ছবি দেখলাম। তারপর স্যার বললেন, 'চলেন ট্যাভেলার্স চেক ভাঙ্গানো যায় কি না দেখি।' এক ব্যাঙ্কে গিয়ে দাঁড়াতেই কাউন্টারের লোকটি জিজ্ঞেস করলো পাসপোর্ট সঙ্গে আছে কি না। স্যারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখলাম আমি, মোটেই অপ্রস্তুত না হয়ে জানালেন যে পাসপোর্ট সঙ্গে নেই বটে তবে তাঁকে লিখা চিঠি আছে। বলে পকেটে হাত দিয়েছেন কি দেননি, লোকটি বললো, ঠিক আছে লাগবে না। ভাঙ্গিয়ে দিলো।

এরপরে আমি বিদায় নিয়ে চলে গেলাম মাহবুবুল হকের বাসায়। সেখান থেকে পরের দিন গেছি লীডসে, তার দু'দিন পরে লীডস ছেড়ে রওনা দিতে হয়েছে লিভারপুলের উদ্দেশে, যে-বন্দর থেকে আমার জাহাজ ধরার কথা।

সমুদ্র ভ্রমণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তন আরেক কাহিনী। সেটি পরের কিস্তিতে বলা যাবে, আপাতত এখানেই থামা যাক।